শুষ্ক ও খরা এলাকার চাষ পদ্ধতি

বলাইলাল জানা
বিমলবিহারী দাস

পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ

শুষ্ক ও খরা এলাকার চাষপদ্ধতি

বলাইলাল জানা, বি. এস-সি. (এজি.) অনার্স (কল্যাণী),
এম. এস-সি. (এজি.) (কল্যাণী)

ও

বিমলবিহারী দাস, বি. এস-সি. (কলিকাতা), বি. এস-সি.
(এজি.) (কল্যাণী), এম. এস-সি. (এজি.) (কল্যাণী)

পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ

SUSKA O KHARA ELAKAR CHAS PADDHATI
[Farming technology of dryland areas]
Balailal Jana
Bimal Behari Das

প্রকাশকাল : জুন, ১৯৮৭

প্রকাশক :
পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ,
(পশ্চিমবঙ্গ সরকারের একটি সংস্থা)
আর্য ম্যানসন (নবম তল),
৬এ, রাজা সুবোধ মল্লিক স্কোয়ার
কলিকাতা-৭০০ ০১৩

মুদ্রক :
শ্রীপ্রবীরকুমার পান
লক্ষ্মী-সরস্বতী প্রেস
২০৯বি, বিধান সরণী
কলিকাতা-৭০০ ০০৬

প্রচ্ছদ : বিমল দাস

মূল্য : আঠার টাকা

Published by Dr. Ladli Mohan Roychowdhury, Chief Executive Officer, West Bengal State Book Board, under the centrally sponsored scheme of production of books and literature in regional languages at the University level of the Government of India in the Ministry of Human Resource Development (Department of Education), New Delhi.

মুখবন্ধ

আধুনিক কৃষি প্রযুক্তিবিদ্যা বিজ্ঞানীদের নিত্য নতুন অনলস গবেষণার ফসল। ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে তাল রেখে কৃষিকে আজ অতি আধুনিক করতে না পারলে ভবিষ্যতের সমস্যা অন্তহীন হয়ে দাঁড়াবে। এখনো আমাদের দেশের শতকরা 70 ভাগ এলাকা অসেচযুক্ত, শুষ্ক, খরাপ্রবণ এবং বৃষ্টিনির্ভরশীল। মাত্র 30 শতাংশ জমি সেচযুক্ত। অথচ এই 70 শতাংশ অসেচ বৃষ্টিনির্ভরশীল শুষ্ক এলাকা থেকেই মোট শস্যের প্রায় 40 শতাংশ খাদ্য উৎপন্ন হয়। সারা বিশ্বের শুষ্ক এলাকায় প্রায় 600 মিলিয়ন লোকের বাস। এই সব এলাকার কৃষিজীবী মানুষ তাদের সীমিত কৃষি উৎপাদনের উপর কোনরকমভাবে জীবিকা নির্বাহ করে। এই অনিশ্চিত শুষ্ক, অর্ধ-শুষ্ক, তথা খরাপ্রবণ এলাকায় বসবাসকারী লোকেদের অর্থনৈতিক তথা সামাজিক অবস্থা খুবই নিম্ন মানের। জোয়ার, বাজরা, ভুট্টা, মাড়োয়া, গুন্দ্‌লী প্রভৃতি ক্ষুদ্র দানাশস্য ; অড়হর, চীনাবাদাম, মুগ, কলাই, ছোলা, সরিষা, তিল, তিসি, সরগুঁজা, কুসুম, রেড়ি প্রভৃতি ডাল ও তৈলবীজ শস্য ; শাকসব্জী ও পশুখাদ্য প্রভৃতি ফসল এই সব এলাকায় প্রাচীন বা চিরাচরিৎ প্রথায় চাষ হয়ে থাকে। জলের অভাবে কৃষকদের বছরে একটি ফসল ঘরে তুলতেই প্রাণান্তকর অবস্থার সৃষ্টি হয়। প্রচণ্ড খরার বছর ফসল অনেক সময় মাঠ থেকে কৃষকদের খামারে ওঠে না বললেই চলে। হেক্টার প্রতি ফলন নিশ্চিত বৃষ্টিপাত ও সেচের ব্যবস্থাযুক্ত এলাকার তুলনায় মাত্র 8 থেকে 10 শতাংশ।

জলবায়ু অবরোধ ছাড়া এই সব এলাকার উঁচু-নীচু, বন্ধুর ভু-অবস্থান, সিঁড়িভাঙ্গা ঢালু জমিতে ভুমিক্ষয় ও জলসংরক্ষণ একটি বিরাট সমস্যা। মাটি ছিদ্রালু, রুক্ষ, পাথুরে, লাল-কাঁকুরে বা কালো এবং শক্ত হয়। সামাজিক-অর্থনৈতিক অবরোধ, দারিদ্রতা ও অন্যান্য প্রযুক্তিগত অন্তরায় প্রভৃতি কৃষি উন্নতির মূল বাধা।

এই সব এলাকায় বনভূমি ও পতিত জমির পরিমাণও ক্রমশঃ হ্রাস পাচ্ছে। এর ফলে আজকাল প্রায়ই জলবায়ুর একটা হঠাৎ পরিবর্তন সহজেই টের পাওয়া যাচ্ছে। বিশেষজ্ঞদের মতে বিভিন্ন পরিবেশ দূষণের ফলে আজকাল বাতাসে কার্বন মনো অক্সাইডের ঘনীভুত অবস্থা বৃদ্ধি পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আবহাওয়ার

উষ্ণতা বৃদ্ধির একটা নিবিড় সম্পর্ক আছে। তাই বনভূমি কেটে ধ্বংস করে আমরা নিজেদের সর্বনাশ ডেকে আনছি। নতুন করে বনভূমি সৃজন ও পুরানো বনভূমি সংরক্ষণ অবশ্যই আজ আমাদের বাঁচার তাগিদে একটি আশু কর্মসূচী হিসাবে নিতে হবে।

শুষ্ক এবং খরাপ্রবণ এলাকার আধুনিক চাষ পদ্ধতি তাই আজ একটি জ্বলন্ত প্রশ্ন। শুষ্ক এলাকার মাটি শুধু তৃষ্ণার্তই নয়, ক্ষুধার্তও বটে। মাটির প্রকৃতি অনুসারে পরিচর্যা ব্যবস্থা, ভূমি ও জল সংরক্ষণ, সুষম সার ব্যবহার প্রভৃতি করে শস্যচাষ পরিকল্পনার আধুনিক ব্যবস্থা নিলে বিশাল এই সমস্যাসংকুল এলাকা থেকে সহজেই অনেক গুণ ফসল উৎপাদন সম্ভব হবে।

এই সব দিক লক্ষ্য রেখেই আমরা **"শুষ্ক ও খরা এলাকার চাষপদ্ধতি"** বইটি লেখার প্রয়াস পেয়েছি। বইটি লেখার ব্যাপারে অনেক পত্র-পত্রিকা, বিভিন্ন গবেষণাপত্র তথা গবেষণাগারের ফলাফল ও বই-এর সাহায্য নিয়েছি। এদের সবার কাছে আমরা কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি। এছাড়া, মুখ্য প্রশাসক, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ, বইটি লেখা ও ছাপার ব্যাপারে যে উৎসাহ দেখিয়েছেন, তার জন্য আমরা বিশেষভাবে কৃতজ্ঞ। বইটি সমস্ত শুষ্ক ও খরাপ্রবণ এলাকার কৃষকদের তথা কৃষি-বিজ্ঞানী, সম্প্রসারণ কর্মী, গবেষক ও কৃষিবিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীদের কিছুমাত্র কাজে লাগলে আমাদের শ্রম সার্থক বলে মনে করবো। এ ব্যাপারে বইটির ভবিষ্যৎ উন্নতিকল্পে সুধীজনের গঠনমূলক সমালোচনা, উপদেশ একান্তই কাম্য।

কলিকাতা,
2রা জুন, 1987

বলাইলাল জানা
ও
বিমলবিহারী দাস

CONTENTS

Introduction—Brief survey of dryland agriculture in India and abroad—Dimensions of the problems of dry farming agriculture in rainfed areas such as—(i) climatic constraints, (ii) soil constraints—moisture stress, nutrient stress, (iii) technological problems or technological constraints, (iv) socio—economical constraints, etc.—Development and transfer of technology for rainfed agriculture—Fertilizer use in dryland rainfed agriculture—potentials and prospects of fertilizer use in arid and semi-arid tropics—suggestions for high-fields and efficient use of inputs—indicative potential of dryland agriculture as shown by achievement levels of various crops in agro-climatic zones in India at each research centre as compared with average farmers' yields—concluding remarks—Glossary of terms and scientific names of various rainfed crops—research findings of rainfed agriculture in West Bengal and other agricultural statistics—list of references cited.

সূচীপত্র

শুষ্ক ও খরা এলাকার চাষ পদ্ধতি

প্রথম অধ্যায়

শুষ্ক ও খরা এলাকার চাষপদ্ধতি

ভূমিকা

শুষ্ক এলাকা বলতে, এককথায়—যেসব এলাকা শুকনো, সেচের কোনরূপ ব্যবস্থা নেই এবং চাষবাস সম্পূর্ণ **বৃষ্টি-নির্ভরশীল** (rain-fed), তাকেই আমরা শুষ্ক এলাকা বলতে পারি। এখন, এই বৃষ্টি-নির্ভরশীল অসেচ এলাকায় বার্ষিক গড় বৃষ্টিপাতের পরিমাণের উপর জমির শুষ্কতা কিরূপ, তা নির্ভর করছে।

শুষ্ক, অর্দ্ধ-শুষ্ক ও খরাপ্রবণ এলাকা ঃ সাধারণতঃ যে সব অঞ্চলে গড় বার্ষিক বৃষ্টিপাত 750 মিলিমিটারের কম, তাকে **শুষ্ক** (Arid), এবং যে সব অঞ্চলে 750—1250 মিমি বৃষ্টিপাত হয়, তাকে **অর্দ্ধ-শুষ্ক** (Semi-arid) এলাকা বলে। আমাদের দেশে উত্তর-পশ্চিমাংশেই মোট চাষযোগ্য জমির প্রায় 65 শতাংশ শুষ্ক এলাকাযুক্ত। পশ্চিমবঙ্গের সমগ্র পুরুলিয়া এবং বাঁকুড়া, বীরভুম ও বর্ধমানের পশ্চিমাংশ এবং মেদিনীপুর (পশ্চিম) প্রভৃতি জেলা **খরাপ্রবণ** (Drought Prone) এলাকা বলে চিহ্নিত। সারা ভারতবর্ষে 13টি রাজ্যের মোট 74টি জেলাকে খরাপ্রবণ এলাকা বলে চিহ্নিত করা হয়েছে।

1970-71 সালে চতুর্থ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা সময়কালীন ভারতবর্ষে প্রথম **গ্রামীণ কার্য প্রকল্প** (Rural works Programme) সুরু হয়। এই প্রকল্পের সঙ্গেই প্রকৃতপক্ষে **খরাপ্রবণ এলাকা প্রকল্পের** (The Drought Prone Areas Programme বা সংক্ষেপে DPAP) জন্ম। 1970-71 সালে দেশে সর্বপ্রথম খরা এলাকাগুলি চিহ্নিতকরণ সুরু হয়। যে সব এলাকা অনিশ্চিত বা কম বৃষ্টিপাতযুক্ত, সেচযুক্ত এলাকার বিস্তৃতি খুবই কম এবং খরার সময়কাল বা উপস্থিতি বেশী বা দীর্ঘস্থায়ী, সেই জেলা বা অঞ্চলকে এই প্রকল্পের অন্তর্ভুক্ত করা হয়। এই প্রকল্পভুক্ত এলাকাগুলিতে মোট প্রায় 600 লক্ষ লোক বাস করে অর্থাৎ যা দেশের মোট জনসংখ্যার 12 শতাংশ। মোট খরাপ্রবণ প্রকল্পের অন্তর্ভুক্ত এলাকার পরিমাণ হ'ল প্রায় 5·65 লক্ষ বর্গ কিলোমিটার বা সারাদেশের প্রায় এক-পঞ্চমাংশের কাছাকাছি।

এই প্রকল্পে বিভিন্ন শ্রম-নিবিড় পরিকল্পনা (labour-intensive schemes), যথা—মাঝারি ও ক্ষুদ্র সেচ, রাস্তা নির্মাণ, মৃত্তিকা সংরক্ষণ ও বনসৃজন (afforestation) প্রভৃতি অন্তর্ভুক্ত।

দেশের শুষ্ক তথা খরাপ্রবণ এলাকার মানচিত্রে পশ্চিমবঙ্গের যদিও প্রায় কোন স্থান নেই, তথাপি এরাজ্যের পশ্চিমাংশের বিস্তীর্ণ এলাকা প্রায়ই খরাক্রান্ত হয়ে শস্যোৎপাদনের বিপুল ক্ষতিসাধন করে। দেশের অন্যান্য খরাপ্রবণ এলাকার তুলনায় এইসব এলাকার গড় বৃষ্টিপাতের পরিমাণ অনেক বেশী, প্রায় 1300 থেকে 1500 মিমি। এই বৃষ্টিপাতে সাধারণভাবে বছরে দুটি ফসল সহজেই হওয়া উচিত। কিন্তু বৃষ্টিপাতের অনিশ্চিত অবস্থা, অসম বিতরণ, খামখেয়ালী আচরণ এবং অনিয়মিত উপস্থিতি প্রভৃতি খরা পরিস্থিতির সৃষ্টি করে। এছাড়া, এইসব খরাপ্রবণ এলাকার জমির বন্ধুর অবস্থান (undulent situations), উঁচু-নীচু ভু-প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্য প্রায়ই খরা পরিস্থিতি সৃষ্টিতে যথেষ্ট সাহায্য করে। তাই এইসব এলাকার কৃষি উৎপাদন রাজ্যের অন্যান্য অংশের তুলনায় অনেক কম এবং অনিশ্চিত।

ভারতবর্ষের **খরাপ্রবণ প্রকল্পের মূলউদ্দেশ্য** (basic objectives) নিম্নরূপ—

- খরা প্রভাবের কঠোরতা কমানো,
- খরা-ক্লিষ্ট এলাকার লোকেদের আয় স্থিতিশীল করা, বিশেষ করে সমাজের দুর্বলতর শ্রেণীর লোকেদের জন্য,
- পরিবেশগত ভারসাম্যের পুনঃ প্রতিষ্ঠা (Restoration of ecological balance), প্রভৃতি।

এরজন্য যে সব প্রকল্প-উপাদান নেওয়া হয়েছে, তাদের মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ উপাদানগুলি নিম্নরূপ—

- জলের সংস্থান বৃদ্ধি ও পরিচর্যাদি,
- মৃত্তিকা ও জলের সংরক্ষণ ব্যবস্থাদি,
- বনসৃজন—বিশেষ করে সামাজিক ও কৃষিজ বনসৃজন বৃদ্ধি করা,
- গোচারণক্ষেত্রের উন্নতিসাধন ও তাদের এলাকা বৃদ্ধি এবং ভেড়াচাষের উন্নতিবিধান ব্যবস্থা,
- পশুপালন ও গো-শালা বা দোহ-শালার উন্নতিবিধান,

● শস্যচাষ পরিকল্পনার কাঠামো পুনর্নির্ণয় ও চাষবাসের পদ্ধতি পরিবর্তন করা, এবং

● অন্যান্য আঙ্গিক জীবিকার উন্নতিসাধন করা, প্রভৃতি।

আমাদের দেশে 2 থেকে 3 বছর কিংবা 5 থেকে 6 বছর অন্তর প্রায়ই খরার প্রকোপ দেখা যায়। ভারতবর্ষে 1966-67 ও 1974-75 সালে ব্যাপক খরা দেখা দিয়েছিল। 1972-73 সালকে **সারা বিশ্বে খরার বছর** বলে চিহ্নিত করা হয়। 1979 সালের প্রাক-খরিফ ও খরিফ মরসুমে সারা দেশে ব্যাপক খরা দেখা দিয়েছিল। এতে প্রায় 45 শতাংশ জমিতে চাষবাস নষ্ট হয়েছিল। 1972 এবং 1979 সালের ব্যাপক খরায় ভারতবর্ষে যথাক্রমে মোট প্রায় 8·5 এবং 20·5 মিলিয়ন টন খাদ্যশস্য বিনষ্ট হয়েছিল। তিন বছর বাদে, অর্থাৎ বিগত 1982 সালে, পশ্চিমবঙ্গে ব্যাপক খরা সুরু হয় একেবারে ভরা বর্ষাকালে। গত 1981 সাল থেকে উত্তরবঙ্গের জেলাগুলি বাদে অন্যান্য সব জেলায় খরা সুরু হয়েছিল। 1981 সালের সেপ্টেম্বরের মাঝামাঝি থেকে হঠাৎ বৃষ্টি বন্ধ হয়ে প্রকৃতপক্ষে আসল খরা পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়। এই সময় ধানে সাধারণতঃ থোড় আসে, দানার পুষ্টিসাধন সুরু হয়। অক্টোবর—নভেম্বরে বৃষ্টি আদৌ না হওয়ায় ঐ বছর প্রকটভাবে খরা সুরু হয়।

একটি কৃষি সমীক্ষায় জানা গেছে, পশ্চিমবঙ্গের গাঙ্গেয় পলিমাটি অঞ্চলে যদি জুলাই থেকে আগষ্ট মাসে একাদিক্রমে 15 দিন বৃষ্টি না হয়ে খরা পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়, তাহলে ধানের পক্ষে তা এক বিরাট প্রতিকূলতার সৃষ্টি করে। এই অবস্থা 21 দিনের বেশী চলতে থাকলেই শতকরা 50 ভাগ ফলন কম হতে বাধ্য।

ভারতবর্ষের শুষ্ক এলাকা—বৃষ্টিপাত, সার ব্যবহার ও শস্য এলাকা এবং শুষ্ক গবেষণা প্রকল্পের অবস্থান, প্রভৃতি

ভারতবর্ষের ভৌগোলিক আয়তন 328 মিলিয়ন হেক্টারের মধ্যে মাত্র 177 মিলিয়ন হেক্টার জমিকে এ পর্যন্ত কৃষিকাজে লাগানো গেছে। তবে এ পর্যন্ত প্রায় 142 মিলিয়ন হেক্টার জমি সরাসরি চাষের আওতায় এসেছে। এই জমির মধ্যে মাত্র 51·7 মিলিয়ন হেক্টার (1981-82 সালের হিসাব অনুযায়ী) জমিতে সেচ ব্যবস্থা সম্ভব হয়েছে। এখনো মোট চাষযোগ্য জমির প্রায় 72 শতাংশ

এলাকা অসেচযুক্ত এবং বৃষ্টি নির্ভরশীল ও মাত্র 28 শতাংশ জমি সেচ ব্যবস্থাযুক্ত। দেশের এই 72 শতাংশ অসেচ বৃষ্টি নির্ভরশীল শুষ্ক এলাকা থেকেই মোট খাদ্য শস্যের প্রায় 40 শতাংশ খাদ্য উৎপন্ন হয়। সারা বিশ্বের শুষ্ক এলাকায় প্রায় 600 মিলিয়ন লোকের বাস। চাষবাসে জোয়ার, বাজরা, ভুট্টা বা জোনার, গুন্দ্‌লী প্রভৃতি ক্ষুদ্র দানাশস্য (small millets), অড়হর, চীনাবাদাম, ছোলা, সরিষা, তিল, তিসি, সরগুঁজা, কুসুম, রেড়ি, শাকসব্জী, পশুখাদ্য প্রভৃতি ফসল চাষ চিরাচরিৎ প্রথায় হয়ে আসছে। জলের অভাবে কৃষকদের বছরে একটি ফসল ঘরে তুলতে প্রাণান্তকর অবস্থার সৃষ্টি হয়। প্রচণ্ড খরার বছর ফসল আর মাঠ থেকে কৃষকদের খামারে ওঠে না বললেই চলে। হেক্টার প্রতি ফলন নিশ্চিত বৃষ্টিপাত ও সেচের তুলনায় মাত্র 8—10 শতাংশ। এইসব এলাকায় কৃষিজীবী মানুষ তাদের সীমিত কৃষি উৎপাদনের উপর কোনরকমভাবে জীবিকা নির্বাহ করে। এই অনিশ্চিত শুষ্ক, অর্ধ-শুষ্ক তথা খরাপ্রবণ এলাকার বসবাসকারী লোকদের অর্থনৈতিক তথা সামাজিক অবস্থা খুবই নিম্নমানের। **জলবায়ু অবরোধ** (climatic constraints) ছাড়া এইসব এলাকায় উঁচু-নীচু, বন্ধুর ভু-অবস্থান (undulent toposequence), সিঁড়িভাঙ্গা ঢালু জমিতে **ভূমিক্ষয়** একটি বিরাট সমস্যা। জমিতে জলধারণ ক্ষমতা খুবই সীমিত, প্রায় নেই বললেই চলে। মাটি ছিদ্রালু, রুক্ষ, পাথুরে, লাল-কাঁকুরে বা কালো এবং শক্ত হয়। এছাড়া **সামাজিক—অর্থনৈতিক অবরোধ** (Socio-economic constraints), দারিদ্রতা, অন্যান্য **প্রযুক্তিগত বাধা** (technological constraints) প্রভৃতি বহুবিধ অন্তরায় কৃষি উন্নতির মূল বাধা। এইসব অঞ্চলে বনভূমি ও পতিত জমির পরিমাণও ক্রমশঃ হ্রাস পাচ্ছে। এতে আজকাল প্রায়ই জলবায়ুর হঠাৎ পরিবর্তন সহজেই টের পাওয়া যাচ্ছে। বিশেষজ্ঞদের মতে বিভিন্ন পরিবেশ দূষণের ফলে আজকাল বাতাসে কার্বন মনো-অক্সাইডের ঘনীভূত অবস্থা বৃদ্ধি হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আবহাওয়ার উষ্ণতাবৃদ্ধির একটা নিবিড় সম্পর্ক আছে। তাই আমরা বনভূমি আরো সৃষ্টি না করে তা হ্রাস করে নিজেদের সর্বনাশ ডেকে আনছি। বৃষ্টিকে আকর্ষণ করার জন্য তাই বনভূমি বা গাছপালার একটা বিশেষ ভূমিকা রয়েছে।

আমাদের দেশে শুষ্ক এলাকার শতকরা 39 ভাগের বেশী জোতজমির আয়তন 0·4 হেক্টারের কম, শতকরা 54 ভাগ জোতজমি 1 হেক্টারের বেশী। বেশীর ভাগ

জমিই ছোট ছোট খণ্ডে বিভক্ত। তাই এইসব জমিতে ব্যাপকভাবে যান্ত্রিক কৃষি ব্যবস্থা (mechanised farming) কার্যকরী করা সম্ভব নয়। ফলে প্রায়ই জনজীবনে চরম দুর্দশার সৃষ্টি হয় এবং মাঝে মাঝে দুর্ভিক্ষের পদধ্বনি শুনতে পাওয়া যায়। কারণ শুষ্ক এলাকায় মূলতঃ ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক তথা শ্রমিক কৃষকদের বসবাসই বেশী। তাই দরকার একটি সুষ্ঠু, সুসংহত আধুনিক কৃষি প্রযুক্তিবিদ্যার প্রায়োগিক চিন্তাধারা।

জাতীয় কৃষি কমিশনের (National Commission on Agriculture) এক সমীক্ষায় এবং FAI Fertilizer Statistics থেকে 1978-79 ও 1984-85 (প্রকৃত) এবং 2000 সালে (আনুমানিক) সারা ভারতবর্ষের চাষবাসের বিভিন্ন এলাকা, সার ব্যবহার চিত্র এবং বিভিন্ন ফসলের উৎপাদন বিষয়ে এক পরিসংখ্যান চিত্র নীচে দেওয়া হ'ল। এতে আমাদের দেশের কৃষিচিত্র সম্বন্ধে একটি স্পষ্ট ধারণা জন্মাবে।

সারণী 1 : ভারতীয় কৃষি উৎপাদন ও সার ব্যবহারের প্রভাব সম্বন্ধে তথ্যাবলী।

বিষয়সূচী	একক	বছর		
		1978-79 (প্রকৃত)	**1984-85 (প্রকৃত)**	**2000 (আনুমানিক)**
লোকসংখ্যা	মিলিয়ন	620	725	935
চাষবাসের এলাকা :				
নীট্‌শস্য এলাকা	মিলিয়ন হেক্টার	142	145	150
মোট দানাশস্য এলাকা	,,	174	181	200
,, সেচ ,,	,,	52	61	84
,, বৃষ্টিনির্ভর ,,	,,	122	120	116
,, দানাশস্যের ,,	,,	127	—	123
,, উচ্চফলনশীল ,,	,,	42	55·4	61

রাসায়নিক সার ব্যবহার ঃ

বিষয়সূচী	একক	বছর		
		1978-79 (প্রকৃত)	1984-85 (প্রকৃত)	2000 (আনুমানিক)
নাইট্রোজেন + (N) ফসফরাস + পটাস (P) (K)	মিলিয়ন টন	5·1	8·2	16·0
ব্যবহৃত সারের মাত্রা	কেজি/হেক্টার	29	46·5	80·0
দানাশস্যের অংশ (share)	শতকরা	75	75	75
বিভিন্ন শস্য কর্তৃক অপসৃত NPK ঘটিত উদ্ভিদ খাদ্যের পরিমাণ	মিলিয়ন টন	15·3	19·3*	26·2*

শস্য উৎপাদন ঃ

দানাশস্য উৎপাদন	মিলিয়ন টন	131	150·5	205—225
রাসায়নিক সার থেকে দানা শস্যের উৎপাদন	”	38	66	120*
রাসায়নিক সারের অবদান (%)	শতকরা	29	40	53
গমের ফলন	টন/হেক্টর	1·6	1·85	2·9
ধানের ফলন	”	1·3	1·46	2·5
বাজরার ফলন	”	0·7	0·64	1·3
ডালশস্যের ফলন	”	0·5	0·54	1·4
চীনাবাদামের ফলন	”	0·8	0·953	1·0**
আখের ফলন	”	5·0	5·59	8·2
তুলার ফলন	”	0·17	0·23	0·38

* পরিসংখ্যানগুলি 163 এবং 225 মিলিয়ন টন খাদ্য শস্যের মাত্রায় নির্ধারিত।

** মোটা দানাশস্যের (বাজরা ও তৈলবীজ—চীনাবাদাম) আনুমানিক লক্ষ্যমাত্রা।

দ্রষ্টব্য : 1978-79 সালের পরিসংখ্যানগুলি Fertilizer Statistics, এবং 1985 ও 2000 সালের পরিসংখ্যানগুলি Report of the National Commission on Agriculture থেকে উদ্ধৃত। মোট ব্যবহৃত সারের উপর দানাশস্যের অংশ 75% হিসাবে ধরা হয়েছে। শস্য উৎপাদনে রাসায়নিক সারের অবদান 10 কেজি দানা/কেজি উদ্ভিদ খাদ্যের উপাদান হিসাবে ধরা হয়েছে।

1985 সালে আমাদের মোট খাদ্যশস্য দরকার ছিল আনুমানিক 725 মিলিয়ন লোক সংখ্যার জন্য 155 মিলিয়ন টন এবং 2000 সালে দরকার হবে 905 মিলিয়ন লোকসংখ্যার জন্য 225 মিলিয়ন টন। 2000 সালে মোট রাসায়নিক সার লাগবে 16 মিলিয়ন টন (75% দানা শস্যের জন্য এবং 25% অন্যান্য শস্য চাষের জন্য)। অর্থাৎ, বর্তমান সার ব্যবহার চিত্র যেখানে 46·0 কেজি/হেক্টার (1984-85 সালের হিসাব অনুযায়ী), তা বেড়ে 2000 সালের প্রারম্ভে দাঁড়াবে 80 কেজি/হেক্টার।

ভারতবর্ষের সার ব্যবহার (NPK) 1951 থেকে 1981 সাল পর্যন্ত 0·06 থেকে5·6 মিলিয়ন টন বৃদ্ধি পেয়েছে এবং বর্তমানে হেক্টার প্রতি সার ব্যবহার দাঁড়িয়েছে মূল শস্য এলাকায় গড়ে 46 কেজি/হেক্টার। সাধারণভাবে বিভিন্ন রাজ্যে হেক্টার প্রতি সার ব্যবহারের পরিমাণ 1 কেজি থেকে 118 কেজি। ভারতবর্ষের 4-5টি রাজ্যেই সার ব্যবহারের পরিমাণ সারা দেশের ব্যবহৃত সারের প্রায় অর্দ্ধেক বা 50 শতাংশ। নীচের পরিসংখ্যান থেকে পূর্বাঞ্চলীয় রাজ্যের সার ব্যবহার চিত্র সম্বন্ধে ধারণা স্পষ্ট হবে।

সারণী 2 : পূর্বাঞ্চলীয় রাজ্যে সার ব্যবহার চিত্র

রাজ্য	সার ব্যবহার করে এমন মোট কৃষক পরিবারের সংখ্যা (%)	মোট শস্য এলাকার সার ব্যবহার যুক্ত এলাকা (%)	মোট সার (NPK) ব্যবহারের পরিমাণ (কেজি/হেক্টার) (1983-84)
আসাম	5·3	3·6	5·4
বিহার	44·9	39·3	26·1
উড়িষ্যা	19·8	15·9	13·8
পশ্চিমবঙ্গ	65·7	49·3	43·6
মধ্যপ্রদেশ	16·4	11·8	14·4
উত্তরপ্রদেশ	44·6	40·8	69·1

আমাদের দেশে শতকরা 48 ভাগ কৃষক, যারা তাদের জমিতে সার ব্যবহার করে, তাদের মধ্যে **ক্ষুদ্র কৃষকের** সংখ্যা (যারা 1 থেকে 2 হেক্টার জমির মালিক) প্রায় 32 শতাংশ।

ভারতে **খরিফ মরশুমে সার ব্যবহারের পরিমাণ** মোট সার ব্যবহারের প্রায় 36 শতাংশ এবং রবি মরশুমে 64 শতাংশ। অথচ দুটি মরশুমে সার ব্যবহারযুক্ত জমির পরিমাণ ঠিক বিপরীত।

ভারতবর্ষে শস্যাভিত্তিক এলাকা ও সার ব্যবহারের অংশ নিম্নরূপ (সারণী 3)।

সারণী 3 : বিভিন্ন শস্যের এলাকা ও তাদের সার ব্যবহারের অংশ

শস্য	মোট শস্য এলাকা (%)	সারা ভারতে সার ব্যবহারের মোট অংশ (%)
ধান	23	40
গম	13	24
আখ	2	9
তুলা	5	7
অন্যান্য ফসল	57	20
মোট	100	100

পরপৃষ্ঠার 1নং চিত্র থেকে সারা ভারতবর্ষের রাজ্যাভিত্তিক সার (উদ্ভিদ খাদ্য) ব্যবহার চিত্র (কেজি/হেক্টর) এবং সেচযুক্ত চাষের এলাকা (%) সম্বন্ধে সম্যক ধারণা জন্মাবে। ভারতে 25% সেচযুক্ত শস্য এলাকায় রাসায়ণিক সার ব্যবহারের ($N+P_2O_5+K_2O$) পরিমাণ 31 কেজি/হেক্টার (1981-82)। বর্তমানে তা বেড়ে 44 কেজি/হেক্টার হয়েছে। পশ্চিমবঙ্গে হয়েছে 55 কেজি/হেক্টর (1984-85)।

চিত্র 2, 3, 4, 5 ও 6 থেকে যথাক্রমে ভারতবর্ষে গড়বার্ষিক বৃষ্টিপাত অনুযায়ী শস্য এলাকার বিস্তৃতি (চিত্র 2), বার্ষিক গড় বৃষ্টিপাতের রেখাচিত্রে (চিত্র 3) জেলাভিত্তিক ভারতের মানচিত্র ও তাতে গড় বার্ষিক বৃষ্টিপাত এবং সেচের বিস্তার (চিত্র 4), মানচিত্রে ভারতে দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমী বায়ু প্রবাহের সূচনা (চিত্র 5) ও সমাপ্তি (চিত্র 6) দেখানো হয়েছে। এর থেকে যে

কেউ সারা ভারতবর্ষের জলবায়ু তথা বৃষ্টিপাতের পরিমাণ ও বিস্তার সম্বন্ধে সম্যক ধারণা লাভ করতে পারবে।
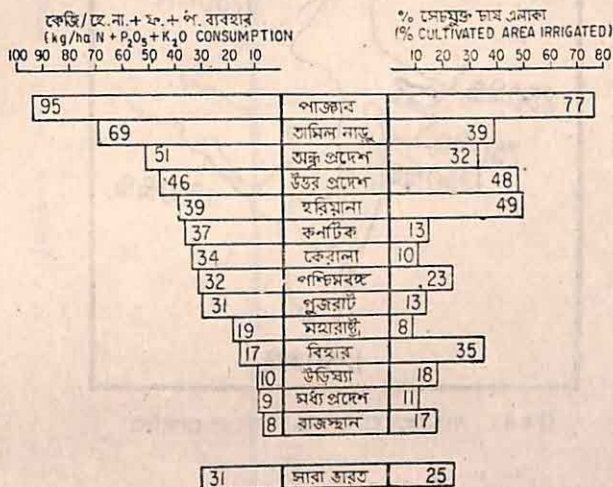
চিত্র 1 : রাজ্যভিত্তিক সার (উদ্ভিদ খাদ্য) ব্যবহার ও সেচযুক্ত চাষের এলাকা
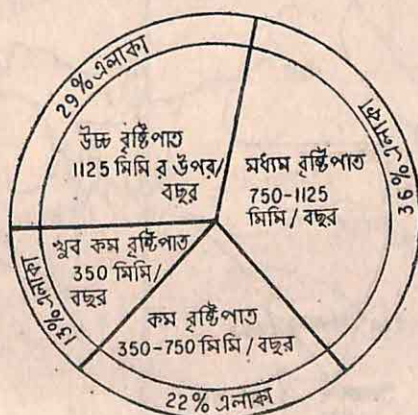
চিত্র 2 : ভারতবর্ষে গড় বার্ষিক বৃষ্টিপাত অনুযায়ী শস্য এলাকার বিস্তৃতি (%)
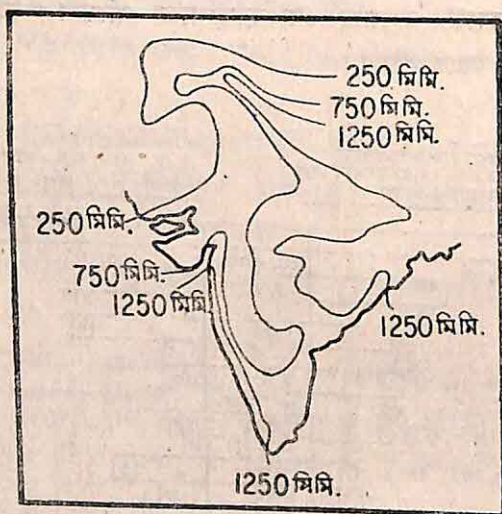
চিত্র 3 : ভারতবর্ষে বার্ষিক গড় বৃষ্টিপাতের রেখাচিত্র

চিত্র 5 :

চিত্র নং 4
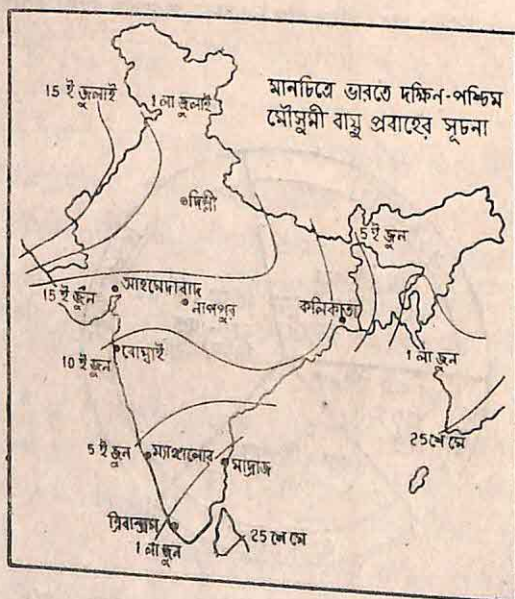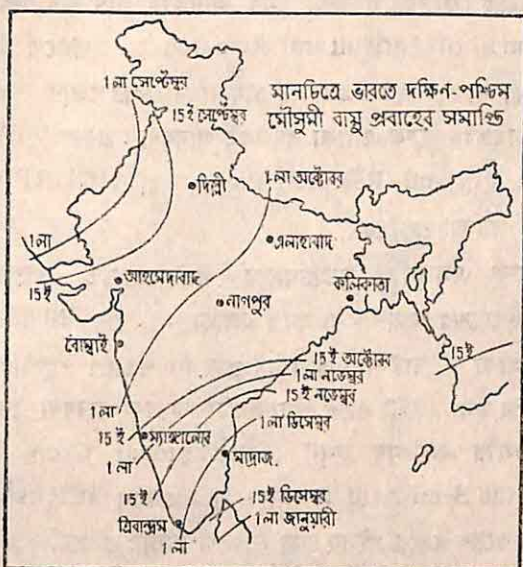
চিত্র 6 :

শুষ্ক এলাকায় চাষাবাসের ইতিহাস :

ভারতবর্ষে শুষ্ক এলাকায় চাষবাসের অসুবিধা দূর করতে প্রথম প্রয়াস সুরু হয় চল্লিশ দশকের সুরুতে। **প্রথম জোর দেওয়া হয় ভূমি ও জল সংরক্ষণের উপর।** তারপর বিশেষ জোর দেওয়া হয় অসমতল বা উঁচু-নীচু ঢালু এলাকায় **কণ্টুর বাঁধ বা সমঢালে বাঁধ নির্মাণের উপর।** ষাট দশকে প্রকৃত সবুজ বিপ্লবের সূচনায় উচ্চফলনশীল বিভিন্ন মেয়াদী ফসলের আবির্ভাব, সেচের জল ও সুষম সার ব্যবহারের উন্নত প্রযুক্তিবিদ্যার ক্রমশঃ ব্যবহারিক প্রয়োগে আমাদের দেশের কৃষি ক্রমশঃ স্ব-নির্ভরতার পথে অগ্রসর হতে সুরু করে। এতদিন শুধু সেচ এলাকা ও উপযুক্ত বৃষ্টিপাতযুক্ত এলাকার মধ্যেই উন্নত চাষবাস ও কৃষি গবেষণা সীমাবদ্ধ ছিল। ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যা বৃদ্ধির চাপে উৎপন্ন খাদ্যের উপর চাপ কমাতে তাই কৃষি বিপ্লব সার্থক করার জন্য ভারতবর্ষ তথা বিশ্বের সমগ্র শুষ্ক অঞ্চলে মাটি, জল, আবহাওয়া, ফসল ও সার ব্যবহারের উপর কৃষি বৈজ্ঞানিকগণ অনলস গবেষণায় মনোনিবেশ করেন। 1926 সালে ভারত সরকার গ্রামীণ কৃষি ও অর্থনীতি সম্বন্ধে অনুসন্ধান করার জন্য একটি কমিশন

গঠন করেন। এরই ফলস্বরূপ জন্ম নেয় **ভারতীয় কৃষি অনুসন্ধান পরিষদ** (Indian Council of Agricultural Research বা সংক্ষেপে ICAR)। 1966 সালে সারা ভারতে শুষ্ক এলাকার চাষবাসের উপর জোর দেওয়ার জন্য গড়ে ওঠে **'সর্বভারতীয় শুষ্ক এলাকা সমন্বিত গবেষণা প্রকল্প'** (All India Co-ordinated Dryland Research Projects বা AICDRP), **'পাইলট প্রজেক্ট অন ড্রাই ল্যান্ড'** প্রভৃতি।

বিশ্বের শুষ্ক এলাকা ঃ হায়দ্রাবাদের পাটানচেরুতে বিশ্বের পাঁচটি মহাদেশের 49টি দেশের আংশিক বা সমগ্র এলাকা বা প্রায় 20 মিলিয়ন বর্গ-কিলোমিটার এলাকা বা মোট শস্য এলাকায় প্রায় 61 শতাংশ শুষ্ক/অর্ধ-শুষ্ক। খরাপ্রবণ এলাকার জন্য 1972 সালে **'আন্তর্জাতিক শস্য গবেষণা কেন্দ্র—অর্ধ-শুষ্ক গ্রীষ্মমণ্ডলীয় এলাকার জন্য'** (International Crops Research Institute for the Semi-Arid Tropics বা সংক্ষেপে ICRISAT) স্থাপন করা হয়। গত কয়েক বছরে এইসব কৃষি গবেষণা বিভাগের সমন্বিত প্রায়োগিক ফলাফল আজ শুষ্ক তথা অর্ধ-শুষ্ক এলাকার কৃষকদের কাছে এক নব দিগন্ত খুলে দিয়েছে।

পরবর্তী পৃষ্ঠার চিত্র 7-এ পৃথিবীর মানচিত্রে সমগ্র বিশ্বে অর্ধ-শুষ্ক গ্রীষ্মমণ্ডলীয় দেশসমূহ (কালো অংশ) দেখানো হয়েছে। ভারতবর্ষের অধিকাংশ এলাকা, দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া ও মধ্য প্রাচ্যের অনেকাংশ, আফ্রিকার দুটি বৃহদাংশ (পূর্ব ও পশ্চিম আফ্রিকা), দক্ষিণ আমেরিকার বহুলাংশে (বলিভিয়া ও আর্জেন্টিনার অংশবিশেষ প্রভৃতি) এবং মেক্সিকোর অধিকাংশ এলাকা ও মধ্য আমেরিকা বা ল্যাটিন আমেরিকা প্রভৃতি শুষ্ক এলাকাভুক্ত।

এইসব এলাকা সাধারণতঃ কর্কশ ও বন্ধুর, বৃষ্টিপাত অনিয়মিত এবং অনিশ্চিত এবং মাটি খুবই অনুর্বর। 600 মিলিয়নের ও বেশি লোক এইসব এলাকায় কোনক্রমে জীবিকা নির্বাহ করে। এইসব এলাকায় শতাব্দী ধরে গতানুগতিক চাষ পদ্ধতিতেই কৃষকরা চাষবাস করে থাকে। বাজরা এবং জোয়ার দুটি ফসল এইসব এলাকার প্রধান শস্য। এছাড়া অড়হর, ছোলা এবং চীনাবাদাম প্রভৃতি অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ ফসল, তেল এবং প্রোটিন দুটি জিনিসই চীনাবাদাম থেকে পাওয়া যায়। তাই **চীনাবাদাম** এইসব শুষ্ক এলাকায় একটি **প্রধান আর্থিক ফসল**। অন্যান্য চারিটি ফসলকে মুখ্যতঃ **জীবিকা নির্বাহকারী**
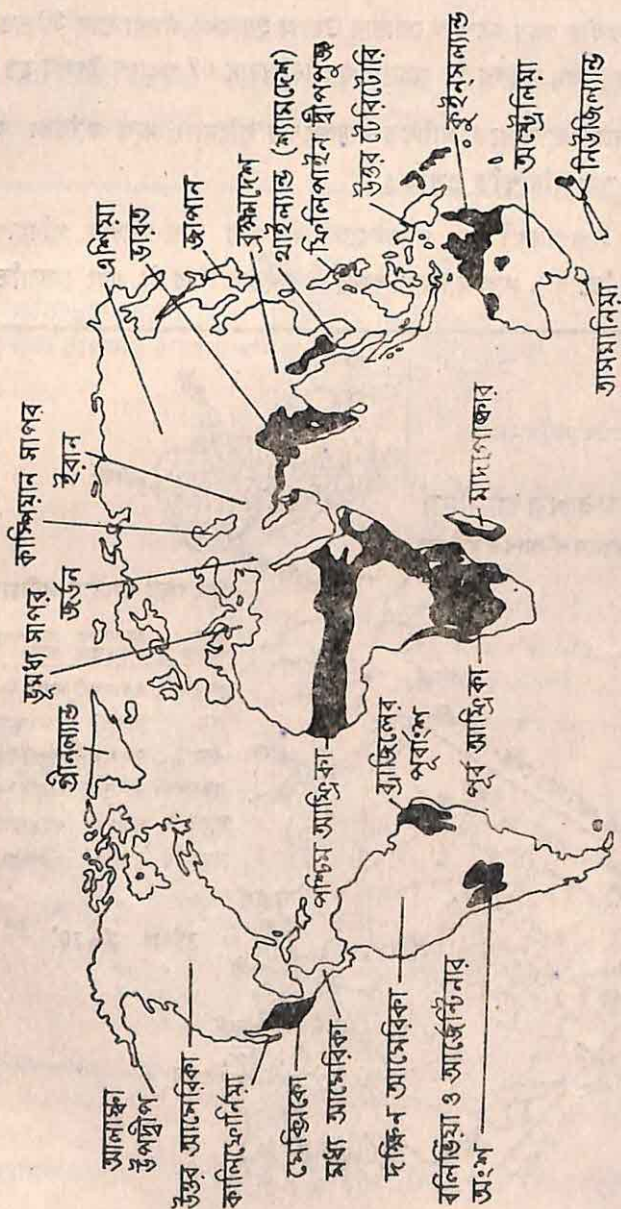
সমগ্র পৃথিবীতে অর্দ্ধ-শুষ্ক গ্রীষ্মমণ্ডলীয় দেশ সমূহ (কালো অংশগুলি)

চিত্র 7 :

খাদ্যশস্য (subsistence focd crops) বলা হয়। অর্ধ-শুষ্ক গ্রীষ্মমণ্ডলীয় দেশসমূহে পৃথিবীর প্রায় অর্ধেক জোয়ার উৎপন্ন হয় এবং বাজরা প্রায় 80 শতাংশ, ছোলা 90 শতাংশ, অড়হর 96 শতাংশ ও চীনাবাদাম 67 শতাংশ উৎপন্ন হয়।

পশ্চিমবঙ্গের বৃষ্টিপাত, মাটিতে খাদ্যশস্যের পরিমাপ, মূল মৃত্তিকা অঞ্চল ও অবস্থান, খরা পরিস্থিতি প্রভৃতি :

চিত্র 8, 9 ও সারণী 4 এ পশ্চিমবঙ্গের মানচিত্রে শস্য-খাদ্যের পরিমাপ ও বৃষ্টিপাত (চিত্র 8), মূল মৃত্তিকা অঞ্চল ও অবস্থান (চিত্র 9) এবং জেলাভিত্তিক

চিত্র 8 :
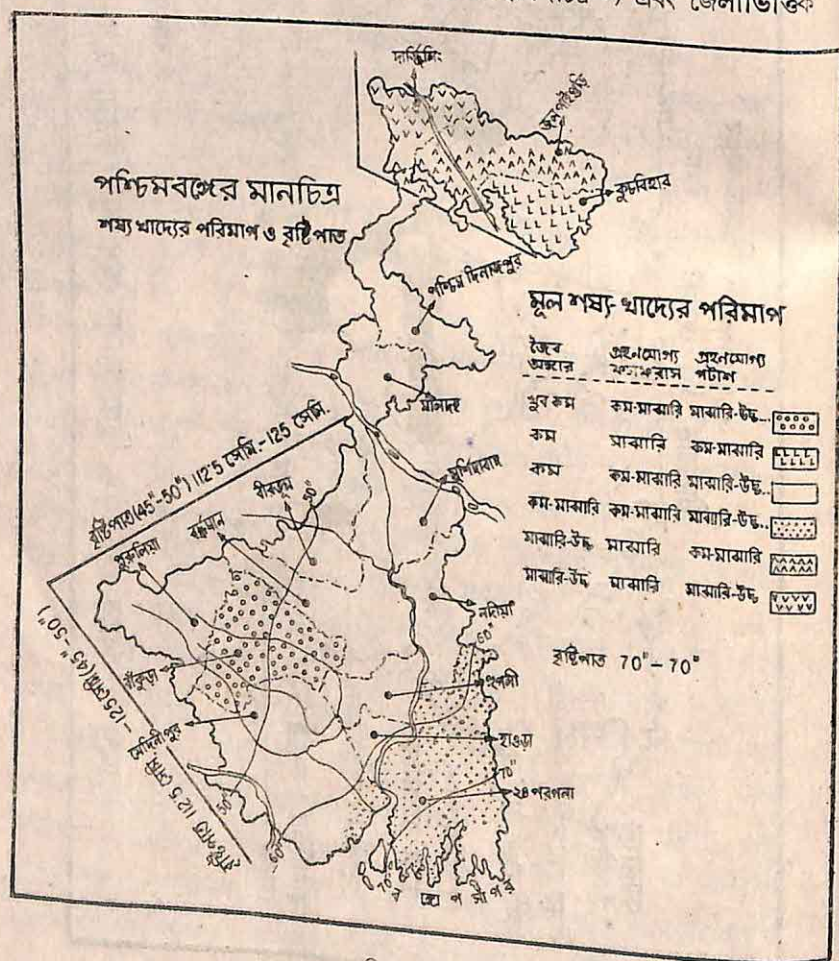
মাটি পরীক্ষার সংক্ষিপ্ত পরিচয় বা উর্বরতার শ্রেণীবিভাগ (সারণী 4) থেকে একটা সুস্পষ্ট ধারণার সৃষ্টি হবে।

1980 সালের সমীক্ষা অনুযায়ী এ রাজ্যের সেচ এলাকা 28 শতাংশ। এ রাজ্যে ভূমিহীন ও প্রান্তিক কৃষক পরিবার (যারা 1 হেক্টার বা 2·5 একর
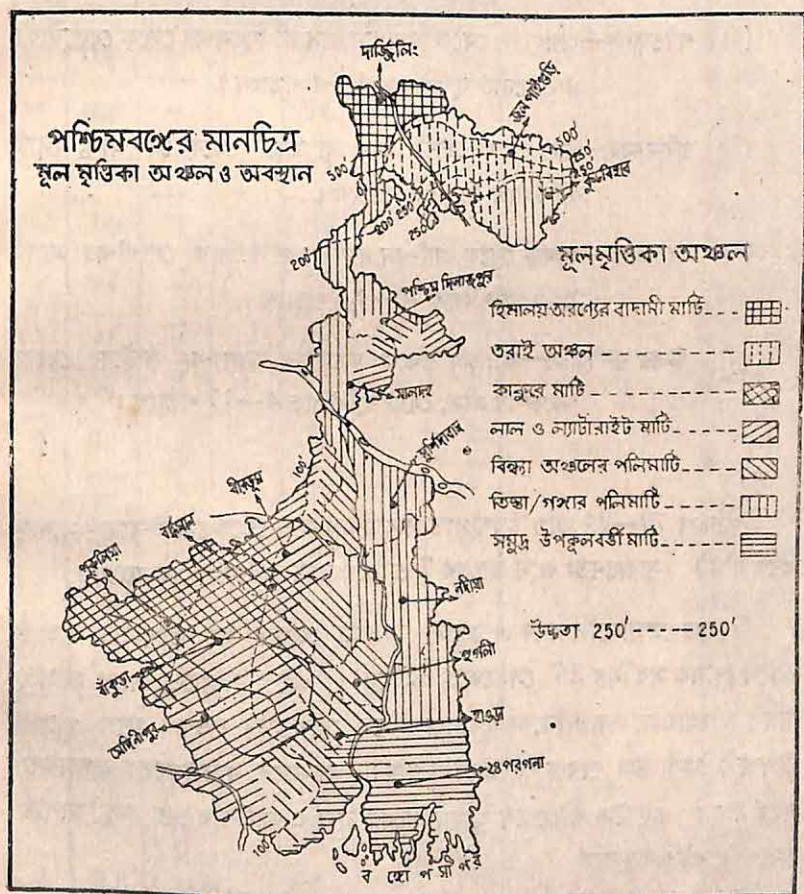
চিত্র 9 :

জমির মালিক) প্রায় 60 শতাংশ, ক্ষুদ্র কৃষক পরিবার (যারা 1—2 হেক্টার জমির মালিক) 22·3 শতাংশ, মধ্যবিত্ত কৃষক পরিবার (যারা 2—4 হেক্টার জমির

মালিক) 3·2 শতাংশ এবং উচ্চবিত্ত কৃষক পরিবার (যারা 4 হেক্টারের বেশী জমির মালিক) 4·5 শতাংশ।

কৃষিকাজ অনুযায়ী পশ্চিমবঙ্গের ঋতুকে (মরসুম) মোট চারভাগে ভাগ করা যায়, যেমন—

(1) শীতকাল—অগ্রহায়ণ থেকে ফাল্গুন মাস বা ডিসেম্বর থেকে ফেব্রুয়ারী মাস, মোট বৃষ্টিপাত 1—4 শতাংশ।

(2) গ্রীষ্মকাল—চৈত্র থেকে জ্যৈষ্ঠ মাস বা মার্চ থেকে মে মাস, মোট বৃষ্টিপাত 6—18 শতাংশ।

(3) বর্ষাকাল—আষাঢ় থেকে আশ্বিন মাস বা জুন থেকে সেপ্টেম্বর মাস, মোট বৃষ্টিপাত 70—84 শতাংশ।

(4) উত্তর বর্ষাকাল—কার্তিক থেকে অগ্রহায়ণ মাস বা অক্টোবর থেকে নভেম্বর মাস, মোট বৃষ্টিপাত 4—17 শতাংশ।

শতকরা 70—84 ভাগ বৃষ্টিপাত সাধারণতঃ জুন থেকে সেপ্টেম্বরের মধ্যেই হয়ে যায়। সাধারণতঃ জুন মাসের 7 তারিখে বর্ষা (Monsoon) আসে।

উত্তরের জেলাগুলি বাদে এ রাজ্যে অন্যান্য জেলায় গড় তাপমাত্রা জুলাই মাসে দৈনিক সর্বনিম্ন 25° সে. থেকে 32° সে.। এই বৃষ্টিপাতের সাথে জুলাই মাসে আবহাওয়া স্বাভাবিকের তুলনায় 8° সে. বেশি গরম হওয়ার ফলে গাঙ্গেয় উপকূলে একটা উষ্ণ প্রবাহ বইতে দেখা যায়। এর ফলে বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা কমে যায়। এই উষ্ণ পরিবেশে আমন ধানের চারা ও আউশ ধানের ফুল আসায় কাজে খুবই ক্ষতি করে।

স্বাভাবিকের তুলনায় যখন বৃষ্টিপাত অর্দ্ধেকের বেশি হ্রাস পায়, তখনই খরা পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়। এই হিসাবে, জুন-জুলাই মাসে পশ্চিমবঙ্গের জেলাগুলিতে প্রায়ই খরা পরিস্থিতির উদ্ভব হয় এবং বছরের অন্যান্য মাসেও দীর্ঘসময় তা প্রকটভাবে স্থায়ী হয়ে নিদারুণ খরার সৃষ্টি করে। সাধারণতঃ উত্তরবঙ্গের

ার-ক্ত	দ্রবণীয় নুনের পরিমাণ			মাটির অবস্থা		
	স্বাভাবিক	অঙ্কুরের ক্ষতিকারক	বৃদ্ধির ক্ষতিকারক	ভারী (এঁটেল জাতীয়)	মাঝারি (দোআঁশ জাতীয়)	হাল্কা (বেলে জাতীয়)
–	100	–	–	96	4	–
–	100	–	--	94	6	–
–	98	2	–	77	23	–
–	99	1	–	56	39	5
1	98	2	–	67	18	15
1	97	2	1	50	41	9
–	99	1	–	93	5	2
2	98	2	–	78	19	3
–	97	3	–	37	34	29
–	96	4	–	40	51	9
–	99	1	–	48	47	5
1	65	26	9	29	60	11
–	100	–	–	65	29	6
–	89	8	3	34	34	32
2	79	16	5	14	32	54
–	94	5	1	50	31	19

যথেষ্ট ।

জেলাগুলিতে বৃষ্টিপাত বেশি হয় এবং দক্ষিণবঙ্গের জেলাগুলিতে অপেক্ষাকৃত অনেক কম বৃষ্টিপাত হয়। তারমধ্যে আবার পুরুলিয়া, বাঁকুড়া, বীরভূম এবং মেদিনীপুর (পশ্চিম) জেলায় বেশি খরা পরিস্থিতি পরিলক্ষিত হয়। খরাপ্রবণ এইসব জেলাগুলির কৃষি সমস্যা তাই অনেক। সম্ভবতঃ ঘন বন-অরণ্যের নিবিড়তার ক্রমবর্ধমান হ্রাসই এর একটি মূল কারণ হতে পারে।

কৃষিবিশেষজ্ঞের মতে স্বাভাবিক মরসুমে যে সব অঞ্চলের মাটিতে মাত্র 10—20 সপ্তাহের মত রস বা জলের যোগান থাকে, সেখানে একাধিক শস্য চাষ সম্ভব নয়। এটা কেবল মাত্র সম্ভব যেখানে 30—50 সপ্তাহ অবধি জল বা রস সরবরাহ অব্যাহত থাকে। 20—30 সপ্তাহব্যাপী জলের যোগান থাকলে সেখানে একাধিক ফসল চাষ **সাথীফসল** (Inter crops) হিসাবে চাষ করা উচিত এবং স্বল্পমেয়াদী জাতের শস্যচাষ করা কর্তব্য (90—120 দিনের মধ্যে তোলা যায় এমন সব শস্যের জাত)। ভারতীয় কৃষি অনুসন্ধান পরিষদ (ICAR) দেশের বিভিন্ন স্থানে এই পরীক্ষা চালিয়ে মোটামুটি একটা সিদ্ধান্তে এসেছে। আরও জানা গেছে, **এঁটেল-দোঁয়াশ মাটিতে** প্রায় 60 সেমি. গভীরতায় 150—160 মিমি জল বা রস, **বেলে-দোঁয়াশ মাটিতে** একই পরিমাণ গভীরতায় 100—120 মিমি রস বা জল থাকতে পারে। এই হিসাবে বিভিন্ন মাটিতে রসের যোগান হিসাব করে বৃষ্টির উপর কতটা নির্ভর করে কি কি ফসল কখন চাষ করা যেতে পারে, তার একটা মোটামুটি ধারণা করে নেওয়া সম্ভব। পরবর্তী পৃষ্ঠার সারণী 5 থেকে **পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন অঞ্চলে সমীক্ষা থেকে পাওয়া মাটিতে রসের সম্ভাব্য সময়কাল** বিষয়ে একটা তথ্য পাওয়া যাবে।

সারণী 5

ক্রমিক নং	যেসব অঞ্চলের জন্য প্রযোজ্য	পর্যবেক্ষণ গ্রহণের স্থান	মাটিতে রসের যোগান থাকার সম্ভাব্যকাল মাস	সপ্তাহ	মন্তব্য
1.	উত্তরবঙ্গের ডুয়ার্স ও তরাই এলাকা	জলপাইগুড়ি (উত্তরবঙ্গ)	এপ্রিলের প্রথম সপ্তাহ থেকে মার্চের প্রথম সপ্তাহ	47	একাধিক ফসল চাষ সম্ভব।
2.	গাঙ্গেয় পলিমাটি	বহরমপুর (মুর্শিদাবাদ)	মে মাসের তৃতীয় সপ্তাহ থেকে ফেব্রুয়ারীর তৃতীয় সপ্তাহ	40	ঐ
3.	পশ্চিমের লাল-কাঁকুরে মাটি	পুরুলিয়া	**বহাল** ঃ জুন মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহ থেকে জানুয়ারীর তৃতীয় সপ্তাহ	33	ঐ
			টাঁড় ঃ জুন মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহ থেকে অক্টোবরের চতুর্থ সপ্তাহ	21	একাধিক ফসল সাথী-ফসল হিসাবে চাষ করা যায়।
4.	উপকূলবর্তী এলাকা	সাগর (২৪-পরগণা দক্ষিণ)	জুনমাসের প্রথম সপ্তাহ থেকে জানুয়ারীর চতুর্থ সপ্তাহ	35	একাধিক ফসল চাষ সম্ভব।

এই সমীক্ষা থেকে বিভিন্ন জায়গায় চাষবাসের একটা মোটামুটি চিন্তা-ভাবনা আগে থাকতে করে নেওয়া যায়। যেমন, আমাদের রাজ্যে (পশ্চিমবঙ্গ) যেখানে প্রায় 75 শতাংশ জমি অসেচ ও বৃষ্টি নির্ভরশীল, সেখানে বিশেষ শুষ্কচাষ পদ্ধতি কৌশল অবলম্বন করে কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি করতে হবে। ধান, পাট

ছাড়া ডালশস্য (অড়হর, ছোলা, মুগ, মুসুর, কলাই, কুলথি বা ঘোড়ামুগ প্রভৃতি), তৈলবীজ শস্য (চিনাবাদাম, তিল, তিসি, সরিষা, সরগুঁজা প্রভৃতি), ভুট্টা, বা জোনার বাজরা, জোয়ার, বার্লি বা যব প্রভৃতি **স্বল্পমেয়াদী** উন্নত জাতের ফসলের চাষ করতে হবে। যেখানে মাটিতে রসের যোগান 30 সপ্তাহের কম, সেখানে বৃষ্টি-নির্ভর ফসল হিসাবে স্বল্পমেয়াদী শাকসব্জী বা শিকড় জাতীয় ফসল (Root crops) চাষ করা উচিত। বৃষ্টি-নির্ভর এলাকায় স্থানীয় শস্যপর্যায় অনুসরণ করে বা তার কিছুটা রদবদল করে এক বা একাধিক ডালশস্য, তৈলবীজ শস্য, ভুট্টা বা জোনার, মাড়োয়া, কোদো, গুন্দলী প্রভৃতি **ক্ষুদ্রদানা শস্যের** চাষ করা সম্ভব।

ভারতীয় কৃষি অনুসন্ধান পরিষদের এক সমীক্ষা থেকে বলা যায়, পশ্চিমবঙ্গের লাল-কাঁকুরে, অম্ল, উঁচু-নীচু জমির অবস্থানে (পুরুলিয়া ও বাঁকুড়া, বীরভূম, মেদিনীপুর পশ্চিম ও বর্ধমানের পশ্চিমাংশ) সব থেকে উঁচু জমিতে একাধিক ফসলের চাষ সম্ভব নয়। কারণ এইসব এলাকায় মাটির গভীরতা 0·03—0·04 মিটার (1—1½ ফুট) বা আরো কম। তাই এইসব উঁচু এলাকায় ধান চাষের ঝুঁকি কখনোই নেওয়া উচিত নয়। কারণ 0·60—0·75 মিটার (2—2½ ফুট) মাটির গভীরতা ছাড়া ধান চাষ ভালভাবে করা যায় না। তাই খরিফ মরসুমে এরূপ উঁচু এলাকায় জোনার বা ভুট্টা জাতীয় ফসল, বাজরা, যব বা বার্লি প্রভৃতি ফসলের চাষ করা উচিত। জোনার জাতীয় ফসলের খরা সহ্য করার ক্ষমতা বেশী। ডাল ও তৈলবীজ জাতীয় শস্যের শিকড় মাটির অনেক গভীরে চলে গিয়ে রস সংগ্রহ করতে পারে। তাই বৃষ্টি নির্ভর অসেচ এলাকায় স্বল্পমেয়াদী উন্নত জাতের ডাল ও তৈলবীজ ফসলের চাষকরা একান্ত কর্তব্য।

দ্বিতীয় অধ্যায়

শুষ্ক ও খরাপ্রবণ এলাকায় চাষাবাদের সংক্ষিপ্ত পর্যালোচনা

(Brief Review of Various Components of Dryland Agriculture)

মাটির প্রকৃতি ঃ শুষ্ক এবং খরাপ্রবণ এলাকার মাটি প্রধানতঃ **কালো** (Black soils) এবং **লাল-কাঁকুরে** (Red and Latertic)। কোন কোন জায়গার মাটি আবার দোআঁশ ও কাঁকুরেযুক্ত হয়। পশ্চিমবঙ্গের খরাপ্রবণ এলাকায় মাটি প্রধানতঃ লাল ও কাঁকুরে শ্রেণীভুক্ত। এইসব এলাকার মাটি প্রায়ই অগভীর (বিশেষতঃ উঁচু অবস্থানের জমির) এবং খুব হাল্কা, বেলে বা বেলে দোঁয়াশযুক্ত, রন্ধ্রবহুল (porous) এবং পি. এইচ. 4·5 থেকে 6·5 এর মধ্যে বা অম্ল থেকে স্বাভাবিক। মাটিতে জৈব পদার্থের পরিমাণ খুবই কম থাকে। এছাড়া গ্রহণযোগ্য ফসফেট, পটাশ এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় উদ্ভিদ খাদ্যের অভাব এইসব এলাকায় একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য। মাটির অতিরিক্ত অম্লত্বের জন্য জীবাণুগুলি জৈবসার থেকে নাইট্রোজেন সারের যোগান আশানুরূপ পায় না। তাই চুন প্রয়োগে মাটি সংশোধন করে প্রভুত উপকার পাওয়া যায়। মাটি যেহেতু অসমতল, বেলে, অগভীর এবং বৃষ্টিকালে বর্ষা অপেক্ষাকৃত বেশী, তাই সবটুকু প্রয়োজনীয় চুন একসঙ্গে দীর্ঘদিন অন্তর প্রয়োগ না করে স্বল্প পরিমাণ চুন প্রতিবছর প্রয়োগ করলে ভাল ফল পাওয়া যাবে। জমির জলধারণ ক্ষমতা, উর্বরতা বৃদ্ধি ও অন্যান্য ভৌত অবস্থা উন্নতির জন্য প্রচুর পরিমাণ জৈবসার ব্যবহার খুবই প্রয়োজন।

ভারতের অন্যান্য শুষ্ক এলাকার মাটি প্রধানতঃ কালো বা লাল। কালো-মাটিতে **মণ্ট্মোরিলোনাইট্** এবং লাল মাটিতে **কেওলিনাইট্** ক্লে-কণা বা খনিজ কাদা বেশি থাকে। প্রকৃতিতে অবস্থিত শিলাস্তর জল ও তাপমাত্রার নানান প্রভাবে চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে দ্রবীভূত হয় এবং এইভাবে প্রস্তুত প্রাকৃতিক দ্রবণের সিলিকা, এ্যালুমিনিয়ম, লোহা, ক্যাটায়ন যোগ খনিজ কাদাকণা তৈরীতে সাহায্য করে। মুক্ত জলনিষ্কাশন ও জারণ প্রক্রিয়ায় লালমাটি এবং এর ঠিক বিপরীত অবস্থায় কালোমাটি প্রস্তুত হয়।

চিত্র ১০ : কাটলযুক্ত কালো মাটি

লালমাটি সাধারণতঃ গ্রানাইট পাথর থেকে প্রস্তুত হয়। এই মাটি খুব হাল্কা, ভেতরের অংশ মৌচাকের মত ফাঁপা। তাই চুঁয়ানো (leaching) বেশী হওয়ার জন্য ক্ষারীয় মৌল, জৈব পদার্থ, নাইট্রোজেন, ফসফরাস ও অণুখাদ্য, বিশেষ করে দস্তা বা জিংক কম থাকে। এই মাটির পি. এইচ সাধারণতঃ 5·5 থেকে 6·5 হয়। মাটির উপরের স্তরের গঠন পাথুরে নুড়ি থেকে বেলে-দোঁয়াশ হয়। নীচের স্তরে কিন্তু ক্রমশঃ কাদার পরিমাণ বাড়তে থাকে। এই মাটির গভীরতা ও জলধারণ ক্ষমতা খুব কম হয়। ফসল চাষের জন্য উপযুক্ত আর্দ্রতার অভাবে সেচের প্রয়োজন হয়। ঢালু এলাকায় লালমাটির ক্ষয়ীভবন প্রক্রিয়া খুব দ্রুত হয়। শুষ্ক অবস্থায় এই মাটি ভীষণ শক্ত হয় এবং জমিতে কর্ষণ করা বেশ কষ্টকর এবং পরিশ্রম সাধ্য ব্যাপার হয়ে দাঁড়ায়। ভেজা অবস্থায় মাটির ক্ষয়ীভবন বৃদ্ধি পায়। গুণাগুণ বিচারে তাই লালমাটিকে সর্বদিক দিয়ে অনুর্বর বলা হয়। ভারতবর্ষে মোট লালমাটি প্রায় 30·4 মিলিয়ন হেক্টার। পশ্চিমবঙ্গে 4,96,346 হেক্টার লাল মাটি এবং 5,88,283 হেক্টার ল্যাটেরাইট মাটি রয়েছে।

কালোমাটি সাধারণভাবে লালমাটি থেকে অনেক বেশী উর্বর। তবে এই মাটি পরিচর্যা করায় অনেক বাধা আছে। এই মাটির গভীরতা, ক্যাটায়ন পরিবর্তন ক্ষমতা (Cation Exchange Capacity), আর্দ্রতা ধরে রাখার ক্ষমতা (Moisture retentive capacity) বেশী এবং জৈব পদার্থ, নাইট্রোজেন, ক্ষারীয় মৌল—বিশেষ করে ক্যালসিয়ামের ভাগ বেশী থাকে। এই মাটিতে কাদা কণা সাধারণতঃ 40—60 শতাংশ থাকে। প্রচণ্ড রোদের দিনে কালো মাটির মাঠ শুকিয়ে শক্ত হয়ে **বড় বড় ফাটলের সৃষ্টি করে** (রঙ্গীন চিত্র 10 দ্রষ্টব্য)। আবার বৃষ্টি পড়লে মাটি ভিজে ফাটলগুলি বন্ধ করে দেয়। কালো মাটিতে কাদার ভাগ বেশী থাকে, তাই মাটি আঠাল ও চট্‌চটে হয়। এতে মাঠে লাঙ্গল দেওয়ার সময় ফলায় মাটি লেগে কর্ষণে বেশ অসুবিধার সৃষ্টি করে। মাঠে ফসল না থাকলে কালোমাটিতে ক্ষয়ীভবন সমস্যা প্রকটভাবে দেখা যায়। ভারতবর্ষে প্রায় 64 মিলিয়ন হেক্টার কালোমাটি রয়েছে। তার মধ্যে 12 মিলিয়ন হেক্টার গভীর কালোমাটি। পশ্চিমবঙ্গে কালোমাটি প্রায় নেই বললেই চলে।

কালোমাটি সাধারণতঃ দু'প্রকার—**মাঝারি কালোমাটি** (Medium black soils) এবং **গভীর বা ঘন কালো মাটি** (Deep black soils)।

যদিও কালোমাটি সাধারণতঃ গ্রানাইট এবং নেইসিস্ (Gneisis) প্রাথমিক শিলা থেকে প্রস্তুত হয়, **মাঝারি কালোমাটির** ব্যুৎপত্তি ব্যাসাল্ট পাথর থেকে। এই মাটির গভীরতা কয়েক সেণ্টিমিটার থেকে 0·6 মিটার পর্যন্ত বা আরো বেশি হয়। কোথাও কোথাও আবার খুবই অগভীর হয় এবং এদের **অগভীর কালোমাটি** (Shallow black soils) বলা যায়। মাঝারি কালোমাটি সাধারণতঃ গুজরাটের সমগ্র সৌরাষ্ট্র অঞ্চলে (উপকূলবর্তী এলাকা ছাড়া), সাবর কান্থারের কিছু তালুক এবং পাঁচমহল জেলা, দক্ষিণ-পশ্চিম আমেদাবাদ জেলা, বরোদা জেলার কিছু অংশ, কুচ জেলার ভুজ তালুক প্রভৃতি এলাকায় দেখা যায়। এই মাটির অধিকাংশই চুনা-গুণ বিশিষ্ট হয় (Calcareous)। কারণ সৌরাষ্ট্র অঞ্চলে প্রাথমিক চুনাপাথর (limestone) থেকেই এই মাটি প্রস্তুত হয়। জুনাগড় জেলার সমুদ্র উপকূলবর্তী এলাকায় একপ্রকার চুনাবালির জমা স্তূপ (coastal deposit of calcareous sand) দেখা যায়। এগুলি শক্ত হয়ে সাদা বা ক্রীমরঙের মুক্ত পাথুরে স্তরে পরিণত হয়। এদের **জুনাগড় চুনাপাথর** (Junagadh lime stone) বা **পোরবন্দর পাথর** বা **মিলিওলাইট** (Meliolite) বলে। এতে 6—12% **গিরনার আগ্নেয়শিলার** (Girnar igneous rocks) অংশ বর্তমান থাকে।

নীচু এলাকা ছাড়া অন্যান্য অবস্থানে এরূপ মাঝারি কালোমাটি অবশিষ্টাংশের বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা যায়। জমির বিভিন্ন অবস্থানে এদের সমতা প্রায়ই থাকে না বললে চলে। কোথাও কোথাও 0·4—0·6 মিটার গভীরতায় চুনাপাথরের শক্ত **মোরাম** (Murum) দেখা যায়। এই মাটির অগভীরতা ও ছিদ্রালু রন্ধ্রপরিসরের জন্য জল নিষ্কাশনের ব্যবস্থার কোন সমস্যা প্রায়ই দেখা যায় না।

মাঝারি কালোমাটির গ্রথনে (texture) সাধারণতঃ কাদাকণা বেশী থাকে। তবে কাদা-দোঁয়াশ গ্রথন খুবই সাধারণভাবে বেশী দেখা যায়। এই মাটির **বিক্রিয়া** সাধারণতঃ নিরপেক্ষ থেকে ক্ষার ধর্মীয়। ক্যালসিয়াম কার্বোনেটের পরিমাণ 3·56 থেকে 22·56% পর্যন্ত দেখা যায়। ক্যাটায়ন পরিবর্তন ক্ষমতায় ক্যালসিয়ামের ভূমিকাই প্রধান এবং তার পরের স্থান ম্যাগনেসিয়াম ধাতুর। গভীরতা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে সোডিয়াম ও পটাসিয়াম ধাতুর পরিমাণ বৃদ্ধি পায়। এছাড়া সিলিকা, এ্যালুমিনিয়াম এবং লৌহ প্রভৃতি ধাতুর উপস্থিতির পরিমাণ খুব কম থাকে। গুজরাটের **সবরকান্থা জেলার** মাঝারি কালোমাটি পরীক্ষা করে দেখা গেছে যে, এইসব মাটি সাধারণতঃ এঁটেল-দোঁয়াশ (clay-loam

থেকে এঁটেল যুক্ত নিরপেক্ষ মাটি। সর্বোচ্চ জলধারণ ক্ষমতা 45—50%, মাঠধারণ ক্ষমতা (field capacity) 22—27%, দৃশ্যমান আপেক্ষিক গুরুত্ব (apparent specific gravity) 1·300—1·314, প্রকৃত আপেক্ষিক গুরুত্ব 2·56—2·61, সচ্ছিদ্রতা (pore space) 46—52%, গুঁড়ামাটি, শতকরা আয়তন বৃদ্ধি (volume expansion) 10 থেকে 13 প্রভৃতি। এইসব মাটির প্রধান কাদাকণা হ'ল **মন্টমোরিলোনাইট্‌**।

গভীর কালোমাটিকে 'রিগারমাটি' (Regur soils) বা **কালো-তুলামাটি** (Black cotton soils) বলে। এই মাটি সাতপুরা এবং বিন্ধ্য এলাকায় কিছু নেইসিস্‌ পাথর ছাড়া ও প্রধানতঃ জীর্ণ পাথরের পচন (decomposition of trap rocks) থেকে সৃষ্টি হয়েছে। বিলম্বিত বহুবিধ বিক্রিয়ার আবর্তনে এইসব পাথরের কাদাকণার অবশিষ্টাংশের সাথে হিউমাস এবং লোহা প্রভৃতি ধাতুর মিশ্রণে রিগার মাটি তৈরী হয়েছে। অন্ধ্র, গুজরাটের সুরাট, ব্রোচ ও বালসার প্রভৃতি জেলার অধিকাংশ এলাকাতে এই মাটির আধিক্য বেশী। এই মাটির গভীরতা 1 মিটার থেকে 6 মিটার পর্যন্ত হয়। মাটির রং ধূসর, ঘন বাদামী বা ঘন কালো বাদামী হয়। মাটির গ্রথন খুব ভারী, কাদাকণার পরিমাণ খুব বেশী। ফলে জল নিষ্কাশন ক্ষমতা খুব কম এবং দ্রবণীয় লবণের পরিমাণ 0·05 থেকে 4·0% হয়। খুব উচ্চ বৃষ্টিপাত এলাকা ছাড়া অন্যান্য জায়গার মাটি সাধারণতঃ চুনাপাথুরে যুক্ত ও নিরপেক্ষ হয়। কম বৃষ্টিযুক্ত এলাকায় বেশি পরিমাণে মুক্ত চুন (free lime) থাকে। মাটির বিক্রিয়া বা পি. এইচ. উচ্চ বৃষ্টিপাত এলাকায় 7·0 ও কম বৃষ্টিপাতযুক্ত এলাকায় 8·5 পর্যন্ত হয়। গভীর কালোমাটিতে 90—180 সেমি. গভীরতায় জল নিষ্কাশন অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে একটি হলুদ স্তর দেখা যায়। হিউমাস এবং নাইট্রোজেনের পরিমাণ সাধারণতঃ খুব কম থাকে এবং ফসফরাসের ঘাটতি প্রায়ই লক্ষ্য করা যায়। গ্রহণযোগ্য ফসফরাসের পরিমাণ 11·2—22·4 কেজি/হেক্টার (অল্‌সন্‌স পদ্ধতিতে) মাত্র দেখা যায়। কাদাকণার পরিমাণ 44—60% বা আরো বেশি থাকে। চুনের পরিমাণ 0·06—1·66%, সিলিকা 45—64%, সর্বোচ্চ জলধারণ ক্ষমতা 55%, মাঠ ধারণ ক্ষমতা (field capacity) 25—30%, দৃশ্যমান আপেক্ষিক গুরুত্ব 1·307 এবং প্রকৃত আপেক্ষিক গুরুত্ব 2·450, মোট সচ্ছিদ্রতা প্রায় 50—55% এবং বিস্তৃতি (expansion) 20—24% প্রভৃতি হয়।

এই মাটি সাধারণভাবে খুব শক্ত, আঠাল ও চটচটে হয় এবং শুকিয়ে গেলে বড় বড় ফাটলের সৃষ্টি হয় (চিত্র—10), যা আগেই সাধারণভাবে কালোমাটির বৈশিষ্ট্য আলোচনার সময় বলা হয়েছে।

কম গভীরতায় এঁটেল-দোঁয়াশ মাটি প্রধানতঃ বেশি দেখা যায়। **মণ্ট্মোরিলোনাইট** এবং **বেইডিলাইট** (Beidelite) কাদা-কণা এতে বেশি থাকে এবং এদের ক্যাটায়ন পরিবর্তন ক্ষমতা 1 মি. ই/গ্রাম (মিলি ইকুইভেলেন্ট/গ্রাম) হয়। নাইট্রোজেন অপেক্ষা ফসফেট সার ব্যবহারের প্রতিক্রিয়া খুব বেশি। তবে এইসব মাটিতে নাইট্রোজেন ও ফসফেট ঘটিত রাসায়নিক সার একসঙ্গে প্রয়োগ করে খুব বেশি সুফল পাওয়া যায়। এইসব মাটির সুপরিচর্যার প্রধান দরকারী বিষয়গুলি হ'ল—মাটির উর্বরতা এবং জলনিষ্কাশন ব্যবস্থার উন্নতি সাধন করা।

মাটি ও জল সংরক্ষণ ঃ বর্ষাকালে অতিরিক্ত জলের স্রোতে লাল মাটির ঢালু জমিতে ভূমিক্ষয় বেশি হয়। জমির উপরের উর্বর স্তরের সঙ্গে সঙ্গে এতে জলের অপচয় ঘটে। প্রচণ্ড রোদের দিনে ধু ধু প্রান্তরে বায়ুর গতিবেগের সাথে সাথে হাল্কা লাল মাটির উপরের স্তরের ধূলিকণা উড়িয়ে নিয়ে ভূমিক্ষয় সৃষ্টি করে। সমতল লাল-মাটিতে বৃষ্টি ও সেচের জল মাটির নীচের স্তরে তাড়াতাড়ি চুঁইয়ে চলে যায়। কালোমাটিতে প্রথম বৃষ্টিপাতের জলে ফাটলগুলি ভরে যায় এবং মাটি ভেজার পর জল প্রবেশের গতি ক্রমশ কমে যায়। তাই শুষ্ক এলাকায় মাটি ও জল সংরক্ষণ একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। এইসব এলাকার মাটি সংরক্ষণ ও সেচের বা বৃষ্টির অতিরিক্ত জলকে সংরক্ষণ করে একাধিক ফসল চাষ করতে হবে। তাই সময়মত কর্ষণ, জৈব আচ্ছাদন (organic mulching) প্রভৃতি দিয়ে মাটি ও জলের সংরক্ষণ ক্ষমতা বৃদ্ধি এবং মাটির জলধারণ ক্ষমতা বাড়াতে হবে।

হায়দ্রাবাদে ICRISAT এর বৈজ্ঞানিকগণ চওড়া বাঁধ দিয়ে লাল ও কালো মাটিতে জল সংগ্রহ ও আর্দ্রতা সংরক্ষণ করে ফসল চাষে সুফল পেয়েছেন। তাঁরা পরীক্ষা করে দেখেছেন, মাঠে ফসল না থাকলে রান অফ্ প্রক্রিয়ায় জলের অপচয় প্রায় পাঁচ গুণ বেড়ে যায়। বিশেষ পরিস্থিতিতে এই রানৃ অফ্ 12 থেকে 23 গুণ বাড়তে পারে। মৃত্তিকা-বৈজ্ঞানিকগণ পরীক্ষা করে দেখেছেন, **কালো-মাটিতে** কোন ফসল না থাকলে মাটিতে জলের প্রবেশের গতিবেগ প্রতি ঘণ্টায়

এক মিলিমিটার হয়। ক্ষেতে বাঁধ ও নালাপদ্ধতিতে (Bed and furrow system) ফসল থাকলে, এই গতিবেগ ঘণ্টায় 6 মিলিমিটার হয়। শুষ্ক এলাকায় গবেষণারত কৃষিবৈজ্ঞানিকদের মতে কালোমাটিতে জিপসাম ব্যবহারে পরিবর্তিত সোডিয়াম (exchangeable Na^{+}) 2—3 ভাগ কমিয়ে মাটিতে জল প্রবেশের গতিবেগ ঘণ্টায় 0·8 মিলিমিটার থেকে বাড়িয়ে 10 মিলিমিটার করা যায়। কালোমাটিতে জৈব আচ্ছাদন দিয়ে আর্দ্রতা সংরক্ষণ ও ভূমির ক্ষয়রোধ বেশ ভালভাবে করা যায়। গভীরভাবে ভূমিকর্ষণে মাটিতে জল প্রবেশের গতি ও জল সংরক্ষণ ক্ষমতা বৃদ্ধি করা যায়।

লালমাটিতে জলপ্রবেশের এই গতিবেগ কালো মাটির চাইতে অনেক বেশি। অথচ এই মাটিতে জলধারণক্ষমতা খুব কম হওয়ায় একের অধিক ফসল চাষে অসুবিধা দেখা দেয়। পরীক্ষা করে দেখা গেছে, সোডিয়াম বাইকার্বোনেট প্রয়োগ করে ক্যালসিয়ামের ভাগ কমিয়ে লালমাটিতে জলধারণ ক্ষমতা বৃদ্ধি করা যায়। হায়দ্রাবাদের ICRISAT বৈজ্ঞানিকগণ পরীক্ষা করে দেখেছেন, 150 সেমি· অন্তর চওড়া বাঁধ দিয়ে মাটিতে জল প্রবেশের গতিবেগ **সীমারেখা বাঁধ** অপেক্ষা শতকরা 25 ভাগ বাড়ানো যায়। রান অফ্ প্রক্রিয়ায় জলের অপচয় লাল মাটিতে সবথেকে বেশি হয়। গত 70 বছরের পরিসংখ্যান থেকে কৃষি প্রযুক্তিগণ জেনেছেন যে, অগভীর লালমাটিতে গড়ে প্রতিবছর 134 মিমি· জল গড়িয়ে যায়। মাঝারি ও গভীর লালমাটিতে গড়ে প্রতিবছর 39 মিমি· জল রান্ অফ্ হয়। তাই লালমাটির এলাকায় বর্ষাকালে ও সেচের অতিরিক্ত জলকে সংগ্রহ করার জন্য উপযুক্ত ট্যাঙ্ক নির্মাণ তৈরীর পরিকল্পনা নিতে হবে।

শস্য পরিকল্পনা ঃ শুষ্ক ও খরাপ্রবণ এলাকায় শস্য পরিকল্পনা করার আগে সেইসব এলাকার গড় বার্ষিক বৃষ্টিপাত ও মাটির আর্দ্রতা কিরূপ, তা দেখতে হবে। হায়দ্রাবাদে গত 70 বছরের গড় বার্ষিক বৃষ্টিপাতের পরিসংখ্যান নিয়ে কৃষি বৈজ্ঞানিকগণ পরীক্ষা করে দেখেছেন যে, **সফল চাষাবাদের জন্য অগভীর লালমাটিতে 50 মিমি., গভীর লাল মাটিতে 150 মিমি.** এবং **মাঝারি ও** গভীর কালোমাটিতে 300 মিমি· গ্রহণযোগ্য জল থাকে। এইসব বৈজ্ঞানিকদের মতে খরিফ মরসুমে অগভীর লাল মাটিতে 17 সপ্তাহ শস্যচাষের উপযোগী জল থাকে। রবি মরসুমে সেচের জলের যোগান অনুযায়ী শস্য পরিকল্পনা নেওয়া উচিত।

শুষ্ক অঞ্চলের প্রায় সব রকম মাটিতেই 70—140 দিনের ফসল চাষের সুষ্ঠু পরিকল্পনা নেওয়া যেতে পারে। গভীর লাল মাটি ও মাঝারি কালো মাটিতে সাথী ফসল এবং গভীর কালো মাটিতে উপযুক্ত শস্য পর্যায়ে একের বেশী ফসল চাষ করার যথেষ্ট সম্ভাবনা রয়েছে। এজন্য কম সেচ দরকার হয়, এমন সব উচ্চফলনশীল স্বল্পমেয়াদী জাতের ফসল নির্বাচন করতে হবে। ফসল চাষে ব্যবহারের দক্ষতা যাচাই করতে উদ্ভিদ বৈজ্ঞানিকগণ সালোকসংশ্লেষ প্রক্রিয়ার প্রাথমিক কার্বক্সিলেশন্ বিক্রিয়ার (carboxillation reaction) ধারাকে অনুধাবন করে বিভিন্ন ফসলকে কয়েকটি বিভাগে ভাগ করেছেন। শুষ্ক এলাকায় জোয়ার, বাজরা, ভুট্টা প্রভৃতি ফসলকে জল ব্যবহারে বেশী দক্ষতাসম্পন্ন ফসল এবং গম, যব, বার্লি, ডালশস্য ও তৈলশস্য প্রভৃতি ফসলকে জল ব্যবহারে কম দক্ষতা সম্পন্ন বলে অভিহিত করেছেন। উদ্ভিদ প্রজননবিদ্গণ বিভিন্ন ফসলের জন্মগত গঠনকে অনুসরণ করে কমজলে অল্পদিনের উচ্চ ফলনশীল জাত আবিষ্কার করেছেন।

আমাদের দেশের শুষ্ক ও খরা এলাকায় উপযোগী ফসল, তাদের উচ্চ-ফলনশীল জাত, উপযুক্ত মাটি, ফসলের সময়কাল, সেচের জলের পরিমাণ, উপযুক্ত বৃষ্টিপাত, প্রভৃতি পরবর্তী পৃষ্ঠায় 6নং সারণীতে দেওয়া হ'ল এবং ফসল, বিভিন্ন মরসুমে বীজ বোনার উপযুক্ত সময় (খরিফ, রবি ও জৈদ বা প্রাক-গ্রীষ্ম) বীজবোনার গভীরতা, বীজের পরিমাণ, সারির দূরত্ব, সেচের সংকটকাল প্রভৃতি 7নং সারণীতে দেওয়া হ'ল।

পশ্চিমবঙ্গের খরাপ্রবণ শুষ্ক এলাকায় জমির অবস্থান বিশেষে বিভিন্ন মরসুমে যে সুষ্ঠু শস্য পরিকল্পনা নেওয়া যেতে পারে, তা সারণী-8 এ দেওয়া হ'ল।

শুষ্ক এলাকায় জলের সুষ্ঠু ও দক্ষ ব্যবস্থাপনা ঃ শুষ্ক এবং খরাপ্রবণ এলাকায় সেচের জলের সুষ্ঠু ও দক্ষ ব্যবস্থাপনা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কারণ চাষবাসের জন্য এসব এলাকায় জলের যোগান অনিশ্চিত। এইসব এলাকার আবহাওয়ায় কম আর্দ্রতায় বাষ্পীভবন ও প্রস্বেদন (evapo-transpiration) বৃদ্ধির অনুপাতে সালোকসংশ্লেষের গতি বৃদ্ধি পায় না। এর ফলে শস্যের ফলন আশানুরূপ হয় না। তাই বীজ বোনার সময় ও পদ্ধতি, উপযুক্ত সেচ ব্যবস্থা, ফসলের বৃদ্ধির সংকটকালে সেচ দিয়ে অল্প জলে ভাল ফসল উৎপন্ন করার ব্যবস্থা নিতে হবে।

সারণী 6

ফসল	বীজবোনার উপযুক্ত সময়			বীজবোনার গভীরতা (সেণ্টিমিটার)	হেক্টর প্রতি বীজের পরিমাণ কিলোগ্রাম	সারির মধ্যে দূরত্ব (সেণ্টিমিটার)	সেচের সংকট কাল
	খরিফ	রবি	জৈদ বা গ্রীষ্মকালীন				দিনে
দানাশস্য :							
জোয়ার	আষাঢ়	আশ্বিন	মাঘ	—	10—12	45 × 15	চারা আসার সময় (15-30) ফুল আসার সময় (90-110)
বাজরা	* ঐ *	কার্তিক	ফাল্গুন	—	ঐ	50 × 15	ফুল আসার আগে দানা তৈরীর সময়
ইটালিয়ান ভুট্টা	ঐ *	আশ্বিন	মাঘ	—	20	75 × 25	বৃদ্ধির প্রথমে (20-40) পুষ্প বিন্যাসে (45-60)
বার্লি	—	15ই কার্তিক থেকে 15ই অগ্রহায়ণ		5—8	80—100	23—28	পাশকাঠির আগে (30) ফুল আসার প্রারম্ভে (80)
গম	—	কার্তিকের প্রথম	—	5—6	100	22·5	মুকুট মূলের প্রারম্ভে (20-25) ফুলের সময় (80-85)
তৈলবীজ :							
চীনাবাদাম	জৈষ্ঠ্য *	আশ্বিন	মাঘ	8—10	110—120	30 × 20	শাখাপ্রশাখার সময় (30-40) ফুলের সময় (60-70)
সরিষা	—	ঐ	—	4—5	5	30 × 15	চারার 4 থেকে 6 টি পাতার সময় (25)
রেড়ি	আষাঢ় *	ভাদ্র	—	—	8—12	120 × 60	সেচ বিহীন

সারণী 6

ফসল	বীজ বোনার উপযুক্ত সময়			বীজবোনার গভীরতা (সেণ্টিমিটার)	হেক্টর প্রতি বীজের পরিমাণ কিলোগ্রাম	সারির মধ্যে দূরত্ব (সেণ্টিমিটার)	সেচের সংকট কাল দিনে
	খরিফ	রবি	জৈদ বা গ্রীষ্মকালীন				
কুসুম	—	আশ্বিন	—	—	5—12	45	শাখাপ্রশাখা বৃদ্ধির সময় (65) ফুলের সময় (105)
সূর্যমুখী	বছরের যে কোন সময়			5	8—10	45 × 30	বীজবোনার 59 এবং 110 দিন পর
সরগুজা	আষাঢ়	—	—	—	7—8	30 × 15	সেচ বিহীন
ডালশস্য :							
ছোলা	—	কার্তিক	—	7—10	55—100	30	ফুল আসার আগে (45)
অড়হর	আষাঢ়	আশ্বিন	—	—	12—15	50	ফুলের সময় (75) বীজের আবরণ পূরণের সময় (100)
পশুখাদ্য :							
জোয়ার	—	—	ফাল্গুন	—	40—50	25—30	চারার প্রথম অবস্থায় (15-30)
বাজরা	—		ঐ	—	10—12	50—60	বীজ বোনার পর 15 এবং 30 দিনে
ভুট্টা	—	—	ঐ	—	60—75	25—30	চারার প্রথম অবস্থায় (15-30)
ওট্	—	কার্তিক	—	—	40—90	20—25	বীজ বোনার পর 20 থেকে 40 দিনে
রোড্স ঘাস	—	—	ফাল্গুন	—	বীজ 5—8 অথবা মূলে 27,700	60 × 60	ঘাসের বৃদ্ধি কালে এক থেকে দুটি সেচ

সারণী—7

উপযোগী ফসল	উচ্চফলনশীল জাত	মাটি	ফসলকাল (দিনে)	সেচের জলের প্রয়োজনীয়তা (মিলিমিটার)	উপযুক্ত বৃষ্টিপাত (মিলিমিটার প্রতিবছর)
দানাশস্য					
জোয়ার	সি. এস. এইচ্-1, সি. এস. এইচ্-5, সি. এস. এইচ্-6	গভীর লাল ও কালো	110-130	140-550	300-1000
বাজরা	এইচ্. বি-3	অগভীর লাল	85-90	150-600	200-500
ইটালিয়ান বাজরা	এম. এস. 1844/2 অর্জুন, আই. সি-700	লাল দোঁয়াশ, কালো	90-110	ঐ	ঐ
ভুট্টা	গঙ্গা-5, গঙ্গা সফেদ-2 ,গঙ্গা-4, ডেকান	গভীর কালো	100-120	100-1250	600
বার্লি	রত্না, আজাদ্, অম্বর, বিজয়, ডি. এল.-3	মাঝারি কালো	120-140	75-360	400-500
গম	সোনালিকা, কল্যাণসোনা, জনক	বেলে দোঁয়াশ, কালো	100-125	220-600	125-1000
তৈলবীজ					
চীনাবাদাম	টি. এম. ভি-1, টি. এম. ভি-9 স্প্যানিস্ ইম্প্রুভড্	গভীর লাল, মাঝারি কালো	120-140	140-700	500-1250
সরিষা	টি-59, এপ্রেস্ট মিউটেন্ট, টোরি বি-54, রাই বি.-85	লাল, কালো	120-140	60-180	250-400
রেড়ি	বি-1, আর-63, অরুণা	লালবেলে দোঁয়াশ	120-160	—	500-750

উপযোগী ফসল	উচ্চফলনশীল জাত	মাটি	ফসলকাল (দিনে)	সেচের জলের প্রয়োজনীয়তা (মিলিমিটার)	উপযুক্ত বৃষ্টিপাত (মিলিমিটার প্রতিবছর)
কুসুম	সি-438, 7-13-3 অজু	কালো, লাল	110-140	120-400	—
সূর্যমুখী	বালগেরিয়ান, ই. সি.-101495 ই. সি.-68414 এবং 68415	লাল	90-120	190-380	—
সরগুজা	নাম্বার-5, নাম্বার-16 এন 87, নাইজার-বি	হাল্কা লাল	80-120	—	1000-1250
ডালশস্য					
ছোলা	বি-108, বি 110, বি 124, এন. পি.-58 কাবুলী, চ্যাফা, আর. এস.-10, আর. এস-11	কালো এঁটেল	130-140	60-480	—
অড়হর	প্রভাত, পন্থ-এ-1, পন্থ এ.-3 টি-21, ইউ. পি. এ. এস.-120	গভীর লাল, কালো	120-150	70-140	—
পশুখাদ্য					
জোয়ার	পুসাচারী, হারিয়ানা চারা, এস. এল.-44 মিঠি সুদান	অগভীর লাল	70-75	—	300-1000
বাজরা	এ-113, এইচ. বি.-3 এস-530 টি-55, ডি-1941	লাল বেলে দোঁয়াশ	50-60	—	200-500
ভুট্টা	কালিমপঙ এর্মিনিলো ডি কিউবা	বেলে দোঁয়াশ	70-80	—	600
ওট	ওয়েসটার্ন-11, বোণ্ট, এ-17	দোঁয়াশ	70-75	—	—
রোডস ঘাস	—	বেলে দোঁয়াশ	80-110	—	—

সারণী ৪
পশ্চিমবঙ্গের খরাপ্রবণ এলাকায় জমির বিভিন্ন অবস্থানে শস্য পরিকল্পনার সুপারিশ :

(ক) সেচবিহীন এলাকায় :

খরিফ মরসুম	রবি মরসুম	প্রাক খরিফ
(১) উঁচু অবস্থানের জমি :		
* বোনাধান (বালা, কাবেরী, কিরণ, রাসি, দুলার প্রভৃতি) 90 থেকে 105 দিন।	* সরগুঁজা (এন. 5, আই. জি.পি. 76)—80 দিন/ শ্বেত সরিষা (বি-9)/ টোরি সরিষা (বি 55, 70-75 দিন)/কুসুম (এ 300)/ তিসি (টি-397) প্রভৃতি।	* —
* ভুট্টা (রাজেন্দ্র মক্কা, কিষাণ কম্পোজিট-70 দিন) বা গঙ্গা সফেদ 95-100 দিন।	* কুলথি কলাই (মধু, বি. আর. 10) বা ঘোড়ামুগ।	* —
* রাগী বা মাড়োয়া (এ 104, পি.আর.202, আই.ই 723 পি. ই. এস. 144, এইচ. আর. 375 প্রভৃতি)	* টোরি সরিষা (বি 54)	* —
* গুন্দলী (ভি 15, ভি 17)।	* ঐ	* —
* চীনাবাদাম (জে. 11, এ.কে 12-24, পোলাচি-1)	* ঐ	* —
* সয়াবীন (জে. এস. 2, ইউ. পি.এস.এম. 19, অলংকার)।	* ঐ	* —
* বরবটি (সি. 152, বর্ষাতি মিউট্যাণ্ট)/ঘোড়ামুখ (মধু, বি. আর. 10) প্রভৃতি।	* সরগুঁজা।	* —
* কলাই (বি. 76 টি. 9)/ কালো মুগ টি. 9)।	* ঐ	* —
* পাট (বীজের জন্য—জে. আর.ও. 632, জে.আর.সি 212	* ঐ	* —

খরিফ মরসুম	রবি মরসুম	প্রাক খরিফ
* মিশ্রচাষ (4:1 বা 6:1)—	* কুসুম/তিসি/রাইসরিষা	* —
—ধান+অড়হর (প্রভাত, টি. 21 প্রভৃতি) —সয়াবীন+অড়হর —ভুট্টা+অড়হর —চীনাবাদাম+অড়হর	* ঐ	
(২) মাঝারি অবস্থানের জমি :		
* রোয়া বা বোনা ধান (রত্না, পদ্মন 579, আ.ই.টি 1444, 2815, 826, 841, 2508, 2914, সি.আর. 126-42-1, সি.এন.এম. 6, 20, 25, 31 (94 থেকে 115 দিন)।	* ছোলা (মহামায়া 1 ও 2। মুসুর (আশা, রঞ্জন) /টোরি সরিষা/সরগুঁজা/রাই সরিষা/শ্বেত সরিষা/খেসারী (নির্মল-60 থেকে 70 দিন)/মটর (বি 22, টি 160/মুগ (বি 1, 105, টি 51) প্রভৃতি।	
(৩) নীচু অবস্থানের জমি :		
* রোয়াধান (বাণী, জয়া, আই. ই.টি. 1039 বা জয়ন্তী, মাসুরী, সি.এন.এম. 25, 20, 31 প্রভৃতি, 130—135 দিন।	* তিসি / ছোলা/ মুসুর পয়রা ফসল হিসাবে খেসারী (নির্মল) প্রভৃতি।	* —
(খ) সেচযুক্ত এলাকায় :		
(১) উঁচু অবস্থানের জমি :		
* চীনাবাদাম / ভুট্টা	* রাইসরিষা/তিসি/কুসুম	* মুগ সোনালী, পান্না) /তিল (বি 67)।
(২) মাঝারি অবস্থানের জমি :		
* রোয়াধান (বিভিন্ন উচ্চ ফলনশীল জাত)।	* গম (সোনালিকা, জনক) /আলু (কুফরী চন্দ্রমুখী, কুফরী অলংকার) / রাই সরিয়া (বরুণা)।	* মুগ/তিল/গ্রীষ্ম কালিন সব্জী/লঙ্কা প্রভৃতি।

খরিফ মরসুম	রবি মরসুম	প্রাক খরিফ
(৩) নীচু অবস্থানের জমি ঃ		
* রোয়াধান (বিভিন্ন উচ্চ ফলনশীল জাত)।	* শীতকালীন সব্জী।	* বোরোধান (পলমন 579, সি. এন. এম. 25, আই. আর. 30, আই.ই.টি 1444 প্রভৃতি।)

শুষ্ক এলাকায় ভূমি ও জল সংরক্ষণের কাজে নিম্নলিখিত বিশেষ ব্যবস্থা প্রয়োজন—

(১) ইঞ্জিনিয়ারিং পদ্ধতি

(ক) ঢালু জমিতে সমঢাল বাঁধ (কন্টুর বাঁধ) বা ঢালের আড়াআড়ি বাঁধ দেওয়া।

(খ) জমিকে ধাপে ধাপে সমতল করা (বেঞ্চ টেরাসিং)।

(গ) খাদ বা নালীক্ষয় নিরোধের জন্য ছোট ছোট জলাধার বাঁধা।

(ঘ) অন্যান্য প্রণালী—যথা উদ্ভিদ প্রণালী, বনসৃজন, ঘাসের জমি উন্নতিকরণ প্রভৃতি। উদ্ভিদ প্রণালীতে ঘাস, গাছপালা ইত্যাদি জমির উপর লাগিয়ে আচ্ছাদন বা আবরণ সৃষ্টি করা।

(২) কৃষি ব্যবস্থাপনা—

(ক) মাটি সংশোধন করে জমির বিভিন্ন অবস্থানে বিভিন্ন ফসল ও জাতের চাষবাস—আগেই আলোচনা হয়েছে।

(খ) ধৈঞ্চা, শন প্রভৃতি চাষ করে জৈবসার হিসাবে পুনরায় ঐ মাটিতে মিশিয়ে দেওয়া প্রভৃতি।

মাঠে আর্দ্রতা কম থাকায় এইসব এলাকায় বীজের অঙ্কুরোদ্গম কম হয়। তাই জমির আর্দ্রতা বুঝে ঠিক সময়ে সঠিক গভীরতায় বীজ বুনতে হবে। এতে চারা অবস্থায় ফসলের আর্দ্রতার অভাব হয় না।

ইজরাইলের শুষ্ক এলাকায় "ড্রিপ" সেচ পদ্ধতিতে ফোঁটা আকারে সেচের জল ফসলের শিকড়ের কাছে প্রয়োগ করা হয়। এতে সেচের জলের অপচয় কম হয়। এইভাবে সেচ দিয়ে অন্যান্য সেচ পদ্ধতি অপেক্ষা শতকরা 50 ভাগ সেচের জলকে দক্ষতা সহকারে সহজেই ব্যবহার করা যায়। এরূপ সেচ পদ্ধতি অনুসরণ করাকে **"নীল বিপ্লব"** (Blue Revolution) বলে। সারা বিশ্বে এরূপ সেচ-

৩

ব্যবস্থা প্রায় 2,00,000 হেক্টারের বেশি জমিতে আছে। এছাড়া বৈজ্ঞানিকগণ ফসলের পাতায় প্রস্বেদন (transpiration) কার্য কমানোর জন্য বিভিন্ন প্রকার **প্রস্বেদন নিরোধক** রাসায়নিক দ্রব্য (anti-transpirants) ছিটিয়ে প্রায় 25-40 ভাগ জল ব্যবহার কমাবার চেষ্টা করছেন। এইসব দ্রব্যের মধ্যে ফিনাইল মারকিউরিক এ্যাসিটেট, এলকিনাইল সাকসিনিক এ্যাসিড প্রভৃতি দ্রবণ ব্যবহারে পত্ররন্ধ্রে (stomata) প্রস্বেদন প্রক্রিয়া কমানো যায়।

জলের অপচয় কমাতে **মালচিং** বা **মাটির উপরে আচ্ছাদন** (soil mulching) ব্যবহারে প্রায় 20—50 ভাগ জল সংরক্ষণ করা যায় এবং বাজরা, গম, বার্লি বা যব প্রভৃতি শস্যের উৎপাদন বৃদ্ধি করা যায়।

সুষম সারের সুষ্ঠু ব্যবহার ঃ শুষ্ক বা খরাপ্রবণ এলাকার মাটি শুধু তৃষ্ণার্তই নয়, ক্ষুধার্ত ও বটে। তাই এইসব এলাকার জমিতে সুষম ও সুষ্ঠু সার ব্যবহার আর একটি অত্যন্ত জরুরি এবং গুরুত্বপূর্ণ বিষয়।

আগেই বলা হয়েছে, সারা ভারতবর্ষে বর্তমানে (1985-85) হেক্টার প্রতি রাসায়নিক সার ব্যবহার মাত্রা মাত্র 46 কেজি। সে তুলনায় রাজস্থান ও মধ্যপ্রদেশ প্রভৃতি রাজ্যের শুষ্ক অঞ্চলে রাসায়নিক সার ব্যবহার হেক্টার প্রতি যথাক্রমে 11·8 ও 14·6 কেজি মাত্র।

পশ্চিমবঙ্গে রাসায়নিক সার ব্যবহারের চিত্র এখনো খুব একটা আশাব্যঞ্জক-ভাবে বৃদ্ধি পায় নি। এখানে 1984-85 সালের সরকারী হিসাব অনুযায়ী গড় রাসায়নিক সার ব্যবহারের পরিমাণ মাত্র 55 কেজি/হেক্টার। সে তুলনায় এ রাজ্যের পুরুলিয়া, বাঁকুড়া, বীরভুম বা মেদিনীপুর (পশ্চিম) জেলাগুলিতে গড়ে রাসারনিক সার ব্যবহার হেক্টার প্রতি মাত্র 20-42 কেজি।

সুতরাং জলের অভাব ছাড়াও গাছের খাদ্যের অভাবের ফলে এইসব শুষ্ক তথা খরাপ্রবণ এলাকায় ভাল চাষবাস হতে পারে না। তাই কৃষিতে আধুনিক শুষ্ক চাষবাস প্রযুক্তিবিদ্যার প্রয়োগ অবশ্যই অপরিহার্য।

শুষ্ক এলাকায় **অম্লভাবাপন্ন নাইট্রোজেন সার** ব্যবহারে ভাল ফল পাওয়া যায়। সোডিয়ামযুক্ত নাইট্রোজেন সারের ব্যবহার অবশ্যই এড়িয়ে যেতে হবে। কারণ এই সার ব্যবহারে মাটিতে ক্ষারত্বের পরিমাণ আরও বৃদ্ধি পাবে।

নানাপ্রকার চলতি রাসায়নিক সারের মধ্যে এ্যামোনিয়াম সালফেট, এ্যামোনিয়াম নাইট্রেট এবং ইউরিয়া সবথেকে ভাল ও উপযোগী সার। বিভিন্ন

কৃষি প্রদর্শনী ও পরীক্ষাক্ষেত্রে দেখা গেছে যে, বাজরায় ইউরিয়া, রাই সরিষাতে 'ক্যান্' (ক্যালসিয়াম এ্যামোনিয়াম নাইট্রেট্) এবং উন্নত জাতের ভুট্টা চাষে এ্যামোনিয়াম সালফেট ও ইউরিয়া খুবই কার্যকরী।

শুষ্ক এলাকায় কম দিনের উচ্চ ফলনশীল জাতের ফসলের জন্য জলে গোলা গুঁড়া ফসফেট ঘটিত সার বিশেষ কার্যকরী। ক্ষার মাটিতে ক্যাল্সিয়াম কার্বোনেটের ভাগ বেশি থাকার ফলে অগ্রহণযোগ্য ক্যালসিয়াম ফসফেট যৌগ তৈরী হয়। সাধারণতঃ 8·2 পি. এইচ. এ সুপারফসফেট স্বাভাবিক থেকে অম্ল জমিতে ডাই এ্যামোনিয়াম ফসফেট (DAP) সার খুবই কার্যকরী। 6·2 এর কম পি. এইচ যুক্ত মাটিতে (অর্থাৎ অম্লজমিতে **রকফসফেট** ব্যবহার করা উচিত। লোনা জমিতে **বেসিক স্ল্যাগ** ব্যবহার করা দরকার। এতে এইসব সারের কার্যকারিতার সুফল বেশি পাওয় যায়। তৈলবীজ ও শিম্বিগোত্রীয় ফসলে ক্যালসিয়াম ও সালফারের (গন্ধক) প্রয়োজনীয়তা বেশি থাকায় সুপার ফসফেট সার সবথেকে ভাল।

শুষ্ক এলাকায় **অণুখাদ্যের** (Micronutrients) মধ্যে জিংক বা **দস্তার** অভাব বেশি দেখা যায় এবং তা জিংক সালফেট দিয়ে পূরণ করা যায়। সার ব্যবহারের কার্যকারিতা বৃদ্ধির জন্য 12—15 সেমি মাটির গভীরতায় সার প্রয়োগ করা উচিত।

সুতরাং পশ্চিমবঙ্গ তথা ভারতবর্ষের বিশাল এই শুষ্ক এবং খরাপ্রবণ এলাকায় আধুনিক শুষ্ক চাষপদ্ধতির প্রযুক্তিবিদ্যা প্রয়োগ করে দেশের সামাজিক তথা অর্থনৈতিক বুনিয়াদ সুদৃঢ় করতে হবে। বিংশ শতাব্দীর শেষে আমাদের দেশের লোকসংখ্যা বেড়ে দাঁড়াবে প্রায় 936 মিলিয়ন এবং আগামী দুই দশকে এই বাড়তি লোকসংখ্যাকে খাওয়াতে আনুমানিক 230 মিলিয়ন টন খাদ্য উৎপাদন করতে হবে। এখন যেখানে মোট উৎপন্ন খাদ্যের প্রায় শতকরা 42 ভাগ কেবলমাত্র শুষ্ক এলাকা থেকে আসে, সেখানে আধুনিক চাষ পদ্ধতি প্রয়োগ করে তা অনায়াসে দ্বিগুণ থেকে তিনগুণ বৃদ্ধি করা যাবে। এইজন্যই দরকার শুষ্ক তথা খরাপ্রবণ এলাকায় আবহাওয়া, মাটি, জল, ফসল ও সামাজিক ও অর্থনৈতিক বিষয়ে আরো ব্যাপক গবেষণা এবং তাদের বিস্তৃত সম্প্রসারণ কর্মসূচীর মাধ্যমে সরাসরি চাষীদের মাঠে পৌঁছে দেওয়া। এতে ভারতবর্ষের গ্রামাঞ্চলের বেকার খেটে-খাওয়া মানুষের কাজের সংস্থান সম্ভব হবে এবং দেশের সমৃদ্ধি বাড়বে।

তৃতীয় অধ্যায়

ভারতবর্ষের মরুভূমি, তাদের এলাকা ও প্রতিরোধের কলাকৌশল

(Desertification—techniques for its Control)

আমাদের দেশের মোট শুষ্ক এলাকার মধ্যে 3·2 লাখ বর্গকিলোমিটার তপ্ত মরুভূমি (hot desert) রয়েছে। তার বেশিরভাগই রাজস্থান, গুজরাট, হরিয়ানা এবং কর্ণাটক রাজ্যে অবস্থিত ও 0·7 লাখ বর্গকিলোমিটার **ঠাণ্ডা মরুভূমি** (cold desert) লাদাখ এলাকায় অবস্থিত। লাদাখের অত্যন্ত ঠাণ্ডা অথচ শুষ্ক আবহাওয়ার সঙ্গে খুব নিম্ন তাপমাত্রায় বছরে মাত্র 5 মাস ফসল চাষ সম্ভব হয়। সেজন্য লাদাখের এই ঠাণ্ডা মরু অঞ্চলে খুব তাড়াতাড়ি চাষ করা যায় এমন সব দানাশস্য, তৈলবীজ শস্য এবং পশু খাদ্যের উচ্চফলনশীল স্বল্পমেয়াদীজাত নির্বাচন করে শস্য পরিকল্পনা নিতে হবে। এছাড়া, **পশ্চিমা উলের** জন্য ভেড়ার চাষ এখানের লোকেদের আর একটি আঙ্গিক জীবিকা-ব্যবসা। গরম মরুভূমি এলাকায় অপর্যাপ্ত সূর্যালোক, জমি ও মাটি সুপরিপর্যায় ভাল ফল দেখানোর ক্ষমতা রাখে। এইসব এলাকায় বিভিন্ন প্রকার পশুখাদ্য বা ঘাস ও বড় বড় গাছের (trees) চাষ ভালভাবে করা সম্ভব। এছাড়া এইসব এলাকায় উন্নত জাতের ভেড়া, ছাগল এবং গবাদি পশুর ভালভাবে প্রতিপালন করা সম্ভব। কারণ জলের অভাব থাকলেও ভূ-গর্ভস্থ জলের স্তর কিছু কিছু স্থানে পাওয়া যায়। **জলই** যেহেতু এইসব ঠাণ্ডা বা গরম মরুভূমি এলাকার একমাত্র সীমাবদ্ধ অবস্থার কারণ, প্রায়ই প্রতিলিটার জলের সর্বোচ্চ আর্থিক ব্যবহারের উপর সর্বপ্রকার চেষ্টা করা কর্তব্য। এটা সম্ভব যদি **পরিবেশগত ভারসাম্যের** (Ecological balance) আর বেশি ব্যাঘাত না করা হয় এবং জমির যথাযথ ব্যবহার করা হয়।

এইসব শুষ্ক মরুভূমির বিভিন্ন প্রতিকূল অবস্থাসমূহ অধিকতর খারাপ হওয়ার দিকে যে ধারায় চলছে, তা ডঃ স্বামীনাথন (1977) তিনটি উদাহরণে এইভাবে ব্যক্ত করেছেন—

প্রথমতঃ পশ্চিম রাজস্থানের যেসব শুষ্ক জমি কেবলমাত্র পশুচারণের জন্যই ব্যবহৃত হ'ত, তা কমে 1951—61 সাল পর্যন্ত 13·9 মিলিয়ন হেক্টার থেকে 11·04 মিলিয়ন হেক্টারে দাঁড়িয়েছে। অথচ এই সময়ে এই চারণক্ষেত্রে নির্ভরশীল

ছাগল, ভেড়া প্রভৃতি চরে খাওয়া বাদে পশুর সংখ্যা 9·4 মিলিয়ন থেকে 14·4 মিলিয়নে দাঁড়িয়েছে। সুতরাং এটা স্পষ্ট, চারণক্ষেত্র কমে গিয়ে তার উপর নির্ভরশীল ছাগল, ভেড়া প্রভৃতি অন্যান্য গবাদি পশুর সংখ্যা দ্রুত বৃদ্ধি পাচ্ছে।

দ্বিতীয়তঃ এই শুষ্ক এলাকার অধিকাংশ জমি যেখানে আগে কেবলমাত্র বনভূমি বা অনুরূপ কাজে ব্যবহৃত হ'ত, তা এখন দ্রুত শস্য চাষবাসের জমি হিসাবে পরিণত হচ্ছে। 1960 সালে যেখানে 26 শতাংশ চাষের জমি ছিল, তা বেড়ে 1970 সালে 38 শতাংশে দাঁড়িয়েছে।

তৃতীয়তঃ এইসব মরুভূমিতে বনভূমির এলাকা মাত্র 2%। অথচ অচাষযোগ্য পতিত জমি 28% এবং অন্যান্য পতিত জমি 18%। এইসব পতিত জমিতে সহজেই *Acacia tortilis*, *Prosopis juliflora* এবং *Eucalyptus* sp. প্রভৃতি ভালভাবে লাগান যায়। এছাড়া বিভিন্ন ফলগাছ, যেমন—বের ফল (ber fruit—*Ziziphus mauritiana*), খেজুর (date plum—*Phoenix dactylifera*), বেদানা (Pomegrante—*Panica granatum*), পেয়ারা (Guava—*Psidium guajava*), কাগজীলেবু (Sour lime—*Citrus . aurantifolia*), আতা (Castard apple), ডুমুর, ফলসা এবং ল্যাসোডা বা গণ্ডা (*Cordia myxa*) প্রভৃতির চাষ সম্ভব।

যেকোন প্রকারে বনভূমি সৃজন করে মরুভূমির রুক্ষতাকে কমাতে হবে—এটাই মরুভূমি সংস্কারের মূলমন্ত্র হওয়া উচিত। ভূমি ও জল সংরক্ষণ এবং বালুয়াড়ী (sand-dune) স্থিতিশীল করণে বিভিন্ন আধুনিক কলাকৌশল সৌভাগ্যবশতঃ আজ প্রযুক্তিবিদদের নাগালের মধ্যে এসেছে। এইসব শুষ্ক ঢালু এলাকাতে বেগবান বায়ুপ্রবাহ ঠেকাতে ঢালের আড়াআড়ি বড় বড় গাছ লাগালে মাটির ক্ষয়ীভবন কমবে এবং মরুভূমিতে ধুলো ওড়ার হার অনেক কমে যাবে। তখন সহজেই এতে পশুর চারণক্ষেত্র (pastures) ও ঘাসচাষ সম্ভব হবে এবং লম্বা সরু ফালির আকারে শস্যচাষ (strip cropping) করা যাবে। বায়ুজনিত ক্ষয়ীভবন রোধ করে বাজরা (*Pennisetum typhoides*) এবং মুগ (*Vigna radiata*) চাষ করা সম্ভব হবে। এতে মরুভূমির যাযাবর উপজাতিরা ধীরে ধীরে এক জায়গায় স্থিতিশীল হবে। এইসব সংস্কার করা মরুভূমি এলাকাতে বিভিন্নভাবে জৈব পদার্থ সংযোজন করলে ধীরে ধীরে মাটির উর্বরতা বৃদ্ধি পাবে এবং মাটির জল ধারণ ক্ষমতা, ভৌত অবস্থা প্রভৃতির উন্নতি ঘটবে (স্বামীনাথন 1977)।

মরুভূমিতে আধুনিক কৃষি পরিকল্পনা

আগেই বলেছি, ভারতবর্ষের উত্তর-পশ্চিমাংশে বিস্তৃত 28,600 বর্গকিলোমিটার এলাকা মরুভূমি অধ্যুসিত। এইসব এলাকায় যৎসামান্য বা আদৌ বৃষ্টিপাত হয় না বললে চলে। ফলে সবুজের সমারোহ এসব এলাকায় নেই। আরাবল্লী রেঞ্জের পশ্চিমভাগের খাড়াই ঢালুস্থান উত্তর-পূর্ব ও দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে প্রসারিত হয়েছে। এই এলাকায় ভু-সংস্থান এবং আবহাওয়াকে (50 মিটার isohyte) পূর্বের মরুভূমির সীমারেখা বলা হয়। পশ্চিমের দিক পাকিস্থানের মরুভূমির সঙ্গে যুক্ত হয়ে গেছে। উত্তর দিকে পাঞ্জাব ও হরিয়ানা রাজ্য পর্যন্ত এবং দক্ষিণে গুজরাট রাজ্য পর্যন্ত মরুভূমি প্রসারিত হয়েছে।

মরুভূমি সৃষ্টির ইতিহাস ঃ আমাদের দেশের সুবিশাল এই কর্কশ, নিষ্প্রভ, অনুর্বর এবং শুষ্ক এইসব এলাকার জলবায়ুর অবনতি, হিমালয়ের বিস্তৃত উত্থান, আরাবল্লীর নীচু অবস্থান ও যমুনা, সরস্বতী এবং ঘাগর—এই তিনটি প্রধান নদীর গতি পরিবর্তন ও অন্তর্ধান, এবং ভূ-গর্ভস্থ জলস্তরের অতি নীচু অবস্থানই মরুভূমির সৃষ্টিতে প্রভূত সাহায্য করেছে। প্রস্তরযুগে রাজস্থান, পাঞ্জাব ও গুজরাটে মানুষের বাসস্থান ছিল বলে প্রত্নতত্ত্বীবিদ্‌গণ বলে থাকেন। জয়পুর এবং ইন্দারগড়ে কোয়ার্টজাইট্ থেকে নির্মিত হস্ত-কুঠারের প্রমাণ পাওয়া গেছে। এগুলি সম্ভবত 2,00,000 বছরের পুরানো বলে প্রমাণিত হয়েছে। সরস্বতী নদীর তীরে কালিবঙ্গন স্থানে হরপ্পা সভ্যতার চিহ্ন খুঁজে পাওয়া গেছে (সম্ভবতঃ 2700 খৃষ্টপূর্বে বলে অভিহিত)। মরুভূমির উত্তরাংশে ঘাগর এলাকায় অসংখ্য স্থানে অনুরূপ সভ্যতার প্রমাণ পাওয়া গেছে।

রাজস্থানের মরুভূমি গত 50 বছর ধরে প্রত্যেক বছরে 1—2 মাইল বিস্তৃত হচ্ছে বলে প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় প্ল্যানিং কমিশনের ধারণা। কিন্তু এই সিদ্ধান্তে বৈজ্ঞানিক মতবাদের মিলের অভাব দেখা যায়। তবে পূর্বদিকে মরুভূমি ক্রমশঃ প্রসারিত হচ্ছে বলে অনেক ভূ-তত্ত্বীবিদ্‌গণ অভিমত ব্যক্ত করেছেন। 1974 সালে এইচ. এস. ম্যান্, মালহোত্রা এবং কল্লা একটি সার্ভে রিপোর্টে বলেছেন যে, রাজস্থান মরুভূমি উত্তর-পূর্বদিকে ক্রমশঃ প্রসারিত হচ্ছে, তবে ইদানিং এই নিথর মরুভূমিতে আবহাওয়ার বেশ একটা পরিবর্তন লক্ষ্য করা যাচ্ছে এবং বৈজ্ঞানিকরা ইজরাইল, লিবিয়া প্রভৃতি ভিন্‌দেশের ন্যায় মরুভূমিতে সবুজ বিপ্লব ঘটিয়ে ফসল ফলাবার জন্য বিভিন্ন গবেষণার কাজে দীর্ঘ দিন ধরে নানা পরীক্ষা নিরীক্ষা চালাচ্ছেন।

মরুভূমির মধ্যে মরুভূমি বিস্তৃতির প্রধান কারণগুলির মধ্যে মানুষ ও গবাদি পশুর ক্রমবর্ধমান সংখ্যা বৃদ্ধি, অসম শুষ্ক জলবায়ু, আবহাওয়া ও অন্যান্য ভূ-তত্ত্বগত অসুবিধাসমূহ প্রভৃতি প্রধান। রাজস্থানের মরুভূমিতে 1901 সালে লোকসংখ্যা যেখানে ছিল 3·42 মিলিয়ন, 1971 সালের আদমসুমারিতে তা বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়িয়েছে 8·84 মিলিয়ন। প্রায় 158% হারে লোকসংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে এবং এই বৃদ্ধি সমগ্র রাজস্থানে মোট জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার (125%) থেকে অনেক বেশি। লোকবসতির ঘনত্ব জয়শালমারের ঝুন ঝুন জেলার থেকে 157 জন / বর্গকিলোমিটার এবং এরা প্রধানতঃ গ্রামীণ অধিবাসী। এদের মধ্যে প্রায় শতকরা 79 জন কৃষির উপর কোন রকমে জীবিকা নির্বাহ করে থাকে। এই পেশায় কোন প্রকার জল সরবরাহ, জমি বা গৃহ-পালিত গবাদি পশুপাখী, বা কোন রকম কলকারখানা, বৃহৎ চাষবাস প্রভৃতি কিছুই নাই। প্রাচীন প্রথায় চাসবাস এবং গবাদি পশুপাখীর চাষবাসই অধিকাংশ রাজস্থান মরুবাসীর প্রধান এবং একমাত্র জীবিকা। তাই ক্রমবর্ধমান জন সংখ্যার চাপ মরুভূমির সামান্য কৃষির উপর খুবই চাপ সৃষ্টি করছে এবং নতুন করে বন সৃজন তো দূরের কথা, যা সামান্য গাছপালা বা বন রয়েছে, এইসব অধিবাসীরা তা কেটে বিক্রি করে জীবিকা নির্বাহ করে থাকে। এইভাবে ক্রমশঃ অতিরিক্ত মরুভূমি সৃষ্টি করে নিজেদের সর্বনাশ ডেকে আনছে। এদের খাদ্যাভাব ও অ-মরুভূমি এলাকা থেকে সম্পূর্ণ ভিন্নতর। 'কুমাটের' (*Acacia senegal*) বীজ, 'করির' (*Capparis decidua*) গাছের ফল এবং *Prosopis cineraria*-র শুঁটি তুলে এরা খাদ্য তৈরী করে। এছাড়া 'ঝাদুবেরীর' (*Zizyphus nummularia*) সমূহ ফল যেসব মরুভূমির এলাকায় হয়, তা থেকে খাদ্য প্রস্তুত করে। কতকগুলি ঘাসের বীজ, যথা—*Panicum turgidum*, *P. antidotale*, *Cenchrus biflorus* এবং *Echinochloa colonum* প্রভৃতির বীজ একসঙ্গে ক্ষুদ্র দানা শস্যের সাথে মিশিয়ে এরা 'চাপাটি' প্রস্তুত করে খায় (বিশেষ করে খরার সময়)।

পশ্চিম রাজস্থানের নিথর শুষ্কাঞ্চলে গবাদি পশুর সংখ্যা মানুষের সংখ্যা থেকে অনেক বেশী। 1951 সালের 9·4 মিলিয়ন থেকে বেড়ে 1972 সালে গবাদি পশুর মোট সংখ্যা দাঁড়ায় 15·5 মিলিয়ন। ছাগল ও ভেড়ার সংখ্যা এই সময়ে 57·1 থেকে 69·3% হয়। 1967-71 পর্যন্ত ক্রমাগত খরার ফলে এই

সব স্থানের অধিবাসীদের যাযাবর জীবন-যাপন ও পশুর মড়কের জন্য মোট সংখ্যা প্রায় 10·8% হ্রাস পায়।

এই সব এলাকার অনুর্বর, ঢালু ও প্রান্তিক জমিগুলির চাষবাস, অতিরিক্ত গোচারণ ক্ষেত্র হিসাবে ব্যবহার, ইঁদুরের ব্যাপক উপদ্রব প্রভৃতি এবং ঘন, গভীর ও বিস্তৃত বালির অবস্থানের জন্য প্রতীনিয়ত বায়ুর দ্বারা ক্ষয়ীভবনের ফলে মরুভূমির এলাকা বিস্তার করতে সাহায্য করছে। সে জন্য যে সব এলাকায় 300 মি মি বৃষ্টিপাত হয়ে থাকে, জাতীয় প্ল্যানিং কমিশন সেইসব এলাকায় পরিকল্পনা মাফিক বৈজ্ঞানিক চাষবাস করার জন্য একটি নির্দিষ্ট কার্যকরী সুপারিশ করেছে।

ইঁদুর অন্যান্য ক্ষয়ক্ষতি ছাড়া ভূমি ক্ষয়েও প্রভূত সাহায্য করে। এছাড়া রয়েছে গরমকালে প্রায়ই পঙ্গপালের উপদ্রব। ভূ-স্তরের সর্বত্র জলের অবস্থান নীচু এবং অস্থায়ী। তাই জলের স্তর কোথায় কিরূপ অবস্থায় আছে, তার বিশদ বিবরণ জেনে একটা মানচিত্র তৈরী করা দরকার। এতে আধুনিক শুষ্ক চাষাবাদের কাজ অনেকটা সহজ হবে।

1973 সালে দাসগুপ্ত, খিলানী ও ভাণ্ডারী এক সমীক্ষায় বলেছেন যে বিভিন্ন মরুভূমি অধ্যুসিত জেলাতে 47·8% ভূ-গর্ভস্থ জলকে নানা উপায়ে কাজে লাগানো সম্ভব হবে। রাজস্থানের জালোর, যোধপুর, পালি এবং সিকার এই চারটি জেলায় প্রায় 50%-এর বেশী ভূ-গর্ভস্থ জলকে কৃষিকাজে লাগানো সম্ভব হয়েছে। এর মধ্যে 7% জলকে সেচের জল হিসাবে ও 13% জল মানুষের ব্যবহারের জন্য লাগানো হয়েছে। সুতরাং আরও ব্যাপকভাবে কতকটা ভূ-গর্ভস্থ জলকে কাজে লাগানো যাবে, তার জন্য নিবিড় কার্যকরী পরিকল্পনার আবশ্যক। এই ভূ-গর্ভস্থ জলের প্রধান সমস্যা হ'ল, অধিকাংশ জলই স্বাদে লোনা। লবণের মাত্রা প্রায় 6-7 গ্রাম দ্রবণীয় লবণ / প্রতি লিটারে বা 10,000 মাইক্রোমোস্। এই জলের সাহায্যেই মরুভূমিতে বার্লি বা যব এবং 'খারচিয়া' গমের চাষ করা হচ্ছে। হিসাব করে দেখা গেছে, প্রায় 0·4 মিলিয়ন হেক্টার জমি লোণা জলে সেচযুক্ত। এই লোনা জলের প্রতি-নিয়ত ব্যবহার কৃষি জমিকে আরো লবণাক্ত করছে এবং কৃষি ও কৃষিজমির পক্ষে এটা মারাত্মক ক্ষতিকর। যে সমস্ত জমিতে 10—16 মিলিমোস্ দ্রবণীয় লবণ জমা হয়, তাদের লবণাক্ততার হার 1—2টি বৃষ্টির পর মোটামুটি 2—6 মিলিমোস্ ই· সি· তে দাঁড়ায় এবং চাষের পক্ষে তখন আবার মোটামুটি উপযুক্ত হয়। কয়েক দশক চাষবাসের পর এই

সব এলাকায় দোআঁশযুক্ত মাটিও চাষের পক্ষে অনুপযুক্ত হয়ে দাঁড়ায়। এইভাবে পুনরায় মরুভূমির এলাকা বৃদ্ধি পেতে থাকে।

Central Arid Zone Research Institute-এর এক সমীক্ষায় জানা গেছে যে, প্রায় 9,290 বর্গ কিলোমিটার বা 4·35% পশ্চিম রাজস্থানের এলাকা মরুভূমিতে পরিণত হয়েছে। উপরিস্তরের বালির স্থান পরিবর্তন এবং মৃত্তিকার ক্ষয়ীভবনই এর মূল কারণ। বিশ্বব্যাঙ্কের সহায়তায় সাম্প্রতিক National Commission on Agriculture on Desert Development এবং Drought Prone Area Programme (D.P.A.P.) এই দুটি বিভাগের সমন্বয়ে অনেক কাজকর্ম চলছে। প্রধান উদ্দেশ্য মরুভূমির নতুন বিস্তৃতি রোধ করা এবং স্থায়ী মরুভূমি এলাকাতে সবুজ বিপ্লব ঘটানো।

ভারতীয় মরুভূমির জলবায়ুর পরিবর্তন : আলিগড় ও কাশগঞ্জের দিকে ফিরোজপুর, পাতিয়ালা এবং আগ্রা থেকে উত্তল বা স্ফীতোদর (convex) অবস্থায় রাজস্থানের মরুভূমি বিস্তারলাভ করছে বলে ভারত সরকারের প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার প্ল্যানিং কমিশন রিপোর্টে বর্ণিত হয়েছে। এতে আরো বলা হয়েছে যে, প্রতি বছর প্রায় অর্ধমাইল হারে গত 50 বছর ধরে মরুভূমি বিস্তার লাভ করছে। অবশ্য এই তথ্যের সঙ্গে বহু ভূ-তত্ত্ববিদ ও কৃষি বৈজ্ঞানিকগণ একমত হতে পারেন নি। তার প্রমাণ পাওয়া গেছে 1952 সালে National Institute of Sciences in India-তে Proceedings of the Symposium on the Rajputana Desert আলোচনাচক্রে। তবে বাস্তবিক-ভাবে বিগত 70 বছরের আবহাওয়া সম্বন্ধীয় পরিসংখ্যান থেকে জলবায়ুর বেশ একটা পরিবর্তন লক্ষ্য করা যাচ্ছে। বিশেষ করে মরুভূমি এলাকার বৃষ্টিপাত, তাপমাত্রা, আর্দ্রতা এবং বায়ুর গতিবেগের ক্ষেত্রে এই পরিবর্তন লক্ষ্যণীয়। সুতরাং এর থেকে এই ধারণা করা অসঙ্গত হবে না যে, রাজস্থানে মরুভূমি আকারে ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাচ্ছে (প্রামাণিক প্রভৃতি, 1952)। এ সম্বন্ধে এর আগেই কিছুটা আলোচনা করা হয়েছে। পশ্চিম রাজস্থানের উঁচু বালুয়াড়ী থেকে বেগবান বায়ু প্রবাহের ফলে তার চার পাশের জমিতে ক্রমশঃ মোটা বালি বা নুড়ি পাথরের জমাস্তর প্রায়ই দেখা যাচ্ছে। এইভাবে প্রতি বছর আস্তে আস্তে এলাকা বিস্তৃত হচ্ছে।

যে সব এলাকায় 500 মি.মি. বার্ষিক গড় বৃষ্টিপাত হয়, সেখানে লবণ সহনশীল কিছু কিছু ঘাস, যেমন—Artemisia এবং sedges ও এখন

Artemisia, *Typha argustata*, *Mimosa rubicaulis* ও *Oldenlandia* প্রভৃতি জন্মায়। এগুলি এমন কি সমকালিন সমশুষ্ক এলাকায় যেখানে 250—500 মি.মি. গড় বার্ষিক বৃষ্টিপাত হয়, সেখানেও ভালভাবে জন্মাচ্ছে এবং আরো শুকনো এলাকা যেখানে 100—250 মি.মি. বার্ষিক গড় বৃষ্টিপাত হচ্ছে, সেখানেও হচ্ছে।

মরুভূমি এলাকায় জমি ব্যবহার চিত্র : মরুভূমি এলাকা সহ ভারতের মোট শুষ্ক এলাকা প্রায় দেশের সমগ্র এলাকার 12%। নীচের সারণী—9 থেকে (1970-71) ভারতবর্ষ ও তার শুষ্ক এলাকাতে জমি ব্যবহারের (Land utilization) পরিমাণ জানা যাবে।

সারণী—9

ভারতবর্ষ ও তার শুষ্ক এলাকাসমূহে জমিব্যবহার চিত্র (1970-71)

(মিলিয়ন হেক্টার)

জমিব্যবহারের শ্রেণী	ভারতবর্ষ		ভারতীয় শুষ্ক এলাকাসমূহ	
	এলাকা	%	এলাকা	%
1. বনভূমিসমূহ	65·9	21·54	0·53	1·88
2. চাষের জন্য প্রাপ্ত নয় (অকৃষিজ ব্যবহার + পতিত + অচাষযোগ্য জমি)	46·2	15·10	6·70	23·25
3. অন্যান্য অচাষযোগ্য জমি-পতিত ছাড়া (স্থায়ী চারণ-ক্ষেত্র এবং চারণ ক্ষেত্রের জমি + বৃক্ষের জন্য জমি + চাষযোগ্য পতিত জমি)	32·5	10·62	5·42	19·30
4. পতিত জমি (বর্তমান পতিত + অন্যান্য)	20·2	6·6	3·3	11·72
5. নীট বপন এলাকা	141·2	46·14	12·2	43·25
মোট ব্যবহার্য জমি	306·0		28·1	
মোট ভৌগোলিক আয়তন	328·0		31·9	

1951-52 থেকে 1973-74 সাল পর্যন্ত জমি রাজস্থানের 12টি পশ্চিম জেলাগুলিতে জমি ব্যবহার পরিসংখ্যান থেকে দেখা যায় যে, প্রায় শতকরা 50 ভাগের বেশী জমিই চাষের অনুপযুক্ত এবং এদের অধিকাংশই পতিত থাকে বা রাখা হয় ও পুরানো পতিত বা অচাষযোগ্য পতিত জমি হিসাবে বর্তমান। 1951তে এই সব এলাকায় 28·51% এবং 1971 সালে 45·05% এলাকায় চাষ হয়েছিল। অথচ এই সময়ে **দো-ফসলী** জমির পরিমাণ ছিল মাত্র 0·41 থেকে 1·45%। বাজরা এই সব এলাকার প্রধান মুখ্য দানা খাদ্য শস্য। এই সব এলাকায় কৃষকদের গড় জোত জমির পরিমাণ 9·9 হেক্টর। 11·2% গৃহস্থের মোট জমির প্রায় 50%-এর বেশী জমির মালিক। অথচ মোট লোকসংখ্যার 47·3% ক্ষুদ্র কৃষকের মোট জমির মাত্র 10% জমি।

শুষ্ক বা মরুভূমি এলাকায় লোনাজলে সেচের প্রভাব ঃ অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে দেখা গেছে, সেচের জলে বিভিন্ন পরিমাণে লবণের উপস্থিতে ফসলের প্রভাবও ভিন্নতর হবে। ধীর ও অন্যান্য (1975) লোণাজলে লংকা, হলুদ, আদা, বেগুন, বাঁধাকপি, টমাটো, পেঁয়াজ প্রভৃতি ফসলের নানা পরীক্ষা করে দেখেছেন যে, 2·5—7·5 মি·ই· / 1 লবণের মাত্রায় লংকা ও হলুদের ফলন 50% হ্রাস পায়, কিন্তু লুসার্ণ জাতীয় পশুখাদ্য সেচের জলে লবণের এই উপস্থিতি সহ্য করতে পারে। লংকা, আদা ও হলুদের সর্বোচ্চ ফলন যথাক্রমে 50, 6 এবং 4 কুইণ্টাল / হেক্টার।

বহির্বিশ্বের মরুভূমিতে সবুজ বিপ্লবের খবর ঃ মরুভূমিতে সবুজ বিপ্লব নিয়ে নানা প্রকার গবেষণার কাজ বহির্বিশ্বের অনেক শুষ্ক তথা মরুভূমিতে চলছে। এরূপ উল্লেখযোগ্য অনেক দেশের মধ্যে এখানে দুটি দেশ **লিবিয়া** এবং **ইজরাইল** উল্লেখ করা যেতে পারে। ইস্রাইলে **"ড্রিপ"** পদ্ধতিতে ফোঁটা আকারে সেচ ব্যবস্থায় কিভাবে **"নীল বিপ্লব"** ঘটেছে, তা দ্বিতীয় অধ্যায়ে আলোচনা করা হয়েছে।

লিবিয়া বা সোসালিস্ট পপুলার লিবিয়ান আরব জামাহিরিয়া—ওপেক গোষ্ঠীয় অন্তর্ভুক্ত একটি দেশ। এই দেশ উত্তর আফ্রিকায় অবস্থিত। ভূমধ্যসাগরীয় আবহাওয়াযুক্ত এই দেশের জলবায়ু খুবই স্বাস্থ্যকর এবং মনোরম। এখানে চিরাচরিৎ মরুভূমির সেই তাপদাহ নেই, আবার হাড়-কাঁপুনি শীতও এখানে নেই। তেলের দৌলতে পৃথিবীর ধনী দেশগুলির অন্যতম লিবিয়ার কৃষি আজ

আধুনিক সজ্জায় সজ্জিত। আফ্রিকার চতুর্থ বৃহত্তম দেশ লিবিয়ার আয়তন 17,60,000 বর্গ কিলোমিটার। এই আয়তনের বৃহত্তর অংশ হ'ল উপকূলবর্তী উর্বর জমি। উপকূলবর্তী এই জমিকে উদ্ধার করে লিবিয়া সরকার চাষবাসের উপযোগী করে তুলেছে। সুষ্ঠু চাষাবাদের জন্য খাদ খনন করে এখানে জল সরবরাহ করা হচ্ছে। এই কিছুকাল আগেই লিবিয়ার কৃষি চরম দুর্দশায় ধুঁকছিল। উট পালন করে, তাদের মাংস খেয়ে এবং খেজুর চাষ করে সাধারণ মানুষ জীবিকা নির্বাহ করতো। তখন ইউরোপ ও আমেরিকার কলোনী হিসাবে লিবিয়া ইতিহাসের পাতায় চিহ্নিত ছিল। সেই লিবিয়ার আজ অবিশ্বাস্য অগ্রগতি বিশ্বের বিস্ময়। সেখানের একজন সাধারণ মানুষের বর্তমান মাথাপিছু আয় একজন সাধারণ ভারতবাসীর থেকে কয়েক গুণ বেশী। এই উন্নতি মূলতঃ তেলের টাকায় হলেও কৃষি কাজের উন্নতি আর একটি প্রধান কারণ। লিবিয়ার কৃষিনীতির লক্ষ্য হ'ল যান্ত্রিক সরঞ্জাম সমৃদ্ধ কৃষি ব্যবস্থার প্রবর্তনের মাধ্যমে মরুভূমি অঞ্চলে সবুজ বিপ্লব প্রবর্তন করা।

1974 সালে এজন্য লিবিয়ার Council of Agriculture Develoment নামে একটি প্রধান সংস্থা গঠিত হয়। 1976-80 সালের মধ্যে Land Reform এবং Integrated Agricultural Development-এর উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়।

1976 সাল পর্যন্ত লিবিয়ার কৃষিতে রীতিমত চাঞ্চল্যকর উন্নতি ঘটেছে। 111টি বিভিন্ন প্রকল্পের মাধ্যমে এদেশে 40,000 হেক্টার অতিরিক্ত শুষ্ক মরুভূমি-যুক্ত জমিকে চাষ যোগ্য করা হয়েছে। 321 বর্গ কি.মি. জমিকে ঘিরে পশুচারণ ক্ষেত্র গড়ে তোলা হয়েছে। কৃষকদের অত্যাধুনিক কৃষি যন্ত্রপাতির ব্যবহার শিখিয়ে ও বিতরণ করে দ্রুত সাফল্য এসেছে। নিকটবর্তী বাজারে কৃষকরা যাতে শীঘ্র পৌঁছতে পারে সেজন্য 1976 সালের মধ্যেই 12370 কি.মি. রাস্তা নির্মাণ করা হয়েছে। পরের চার বছরে আরো কয়েক হাজার কি.মি. পাকা রাস্তা নির্মাণ সম্পূর্ণ হয়েছে।

1976-80 সাল পর্যন্ত 3,03,709 হেক্টার জমিকে আধুনিক বিজ্ঞান সম্মত ফলের বাগান ও সব্জি বাগান হিসাবে তৈরী করা হয়েছে এবং 6,54,620 হেক্টার জমিকে সংরক্ষিত পশুচারণ ক্ষেত্র ছাড়া বনভূমির জন্য সংরক্ষিত করা হয়েছে।

1980 সালের মধ্যে 336 হাজার টন গম, 245 হাজার টন বার্লি বা যব, 285 হাজার টন সব্জি, 255 হাজার টন ফল উৎপাদন করে সাফল্যের নজির তারা গড়ে তুলেছে।

মরুভূমিতে খেজুর কাঁটাঝোপ প্রভৃতি ছাড়া অন্য কিছু গাছপালা জন্মায় না বলে চিরাচরিত বদ্ধমূল ধারণা। অথচ মরুভূমিতে আজ এই সব সবুজের সমারোহ সমস্ত শুষ্ক দেশের শুষ্ক তথা খরাপ্রবণ কৃষককুলের কাছে একটা প্রেরণার উৎস স্বরূপ এবং বড় চ্যালেঞ্জ।

চতুর্থ অধ্যায়

শুষ্ক এলাকার চাষবাসে বিবিধ সমস্যাবলী ও তাদের প্রতিকার

(Problems of Dryland Agriculture & their Remedies)

শুষ্ক এলাকার বিবিধ সমস্যাবলী সম্বন্ধে এযাবৎ বহু জাতীয় সেমিনারে আলোচিত হয়েছে। কিছু সমস্যা নিয়ে আমরা এর আগের অধ্যায় গুলিতেও বলার চেষ্টা করেছি। এই সব বিবিধ সমস্যাবলীকে মোটামুটি 4 ভাগে ভাগ করা যায়, যথা—

(1) জলবায়ুজনিত বাধা বা অবরোধ (Climatic constraints),
(2) মৃত্তিকা জনিত অবরোধ (Soil constraints),
(3) প্রযুক্তিবিদ্যাজনিত অবরোধ (Technological constraints), এবং
(4) সামাজিক—অর্থনৈতিক জনিত অবরোধ (Socio-economic constraints)।

(1) জলবায়ুজনিত অবরোধ (Climatic constraints) :

স্থান ও সময় বিশেষে বৃষ্টিপাতের অনির্ভরশীলতা বা অনিশ্চিত অবস্থা এবং পরিবর্তনশীলতা বৃষ্টি-নির্ভরশীল এলাকার চাষবাসে একটি সব থেকে বৃহত্তম সমস্যা। খরা এবং বন্যা অনেক সময় একই বছরে একই এলাকায়, এমন কি একই জমিতে সাধারণভাবে দৃশ্যমান হয় ও শস্য উৎপাদনের প্রভূত ক্ষতি সাধন করে। আবহাওয়ার সামান্য পরিবর্তন—কলাকৌশল এখনো পর্যন্ত সম্ভব হয় নি। কিন্তু আমরা এই দেশের বিগত 100 বছরের আবহাওয়া বা জলবায়ুর বিভিন্ন প্রাপ্ত উপাদানের পরিসংখ্যানকে পর্যালোচনা করে এখনো পর্যন্ত তা কৃষিকাজে লাগাতে পারিনি বা সেইমত চাষবাসের ব্যাপক পরিকল্পনা গ্রহণ করতে পারিনি। উদাহরণস্বরূপ, মাঝারি বৃষ্টিপাত এলাকার (750—1250 মিমি) গভীর কালোমাটি অঞ্চলে মৌসুমী বায়ু প্রবাহের সম্ভাব্য সময় অনুযায়ী বিভিন্ন ফসলের শুষ্ক বপনে কয়েক মিলিয়ন হেক্টর জমিতে এক ফসলী থেকে দো-ফসলী জমিতে পরিণত করা সম্ভব।

কৃষি-জলবায়ু সম্বন্ধীয় বিভিন্ন তথ্য, সঠিক জাত, শস্যচাষরীতি বা পদ্ধতি (cropping systems), জল সংগ্রহ (water harvesting) এবং

নির্ধারিত উৎপাদন—লক্ষ্যমাত্রায় পৌঁছতে শস্যের মডেল প্রভৃতি বাছাই খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

(2) **মৃত্তিকাজনিত অবরোধ** (Soil constraints):

বৃষ্টি নির্ভর শস্যচাষ এলাকায় মৃত্তিকা জনিত প্রধান সমস্যাগুলির মধ্যে **মাটির অনুর্বরতা** বা **খাদ্য-উপাদানের অভাব** (nutrient stress), **ভূমিক্ষয়, জল-নিষ্কাশন** কিছু মাটিতে **নিম্ন জল গ্রহণ ক্ষমতার** হার এবং **অতিরিক্ত চুয়ানো** (percolation) ও **নিম্ন ধারণ ক্ষমতা** (low retentivity) প্রভৃতি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ।

এছাড়া মৃত্তিকার লবণাক্ততা, ক্ষারত্ব এবং এ্যালুমিনিয়াম বিষাক্ততা প্রভৃতি অন্যান্য সমস্যাগুলিও শুষ্ক এলাকার চাষবাসে এক বড় বাধা।

এটা সব থেকে ভাল করে **অনুধাবন** করা দরকার যে, শুষ্ক এলাকার সীমিত উৎপাদনের জন্য মূলতঃ দুটি সমস্যা খুবই প্রখর, যথা—(1) **মাটিতে রসের পীড়ন** বা **ঘাটতি** (moisture stress) বা জল-জনিত অবরোধ এবং (2) শস্যের **খাদ্য উপাদানের অভাব**। এইসব ঢালু, উঁচু-নীচু, বন্ধুর এলাকায় **সমঢালে বাঁধ নির্মাণ কৌশল** (contour bunding techniques) মৃত্তিকা সংরক্ষণে সাহায্য করে।

(ক) **মাটিতে রসের অবরোধ বা পীড়ন** (Moisture stress):

জলবায়ু-জনিত অবরোধগুলির মধ্যে, রসের পীড়ন একটি মারাত্মক ও ক্ষতিকর সমস্যা। যে কোন দেশের শুষ্ক এলাকায় শস্য পরিকল্পনার ক্ষেত্রে এই অবরোধ দূরীকরণের উপর প্রাথমিক গুরুত্ব দেওয়া হয়। সাধারণতঃ তিন-ভাবে মাটিতে রসের পীড়ন দূর করা যায়,—(1) রসের সংরক্ষণ ও বৃষ্টির জলের উত্তম পরিচর্য্যা, (2) গড়িয়ে যাওয়া জলের সংগ্রহ ও গাছের প্রাণ বাঁচানোতে সেচের মাধ্যমে তার ব্যবহার, এবং (3) শুষ্ক এলাকায় সেচের আংশিক সংস্থানে বিভিন্ন সেচ পদ্ধতির সম্প্রসারণ প্রভৃতি।

এই তৃতীয় পদ্ধতিতে মাটির রসের পীড়ন দূর করার জন্য পরিকল্পকরা সব থেকে বেশী নজর দিচ্ছেন। আগামী 5 বছরে মোট সেচ এলাকা দ্বিগুণ হবে বলে আশা করা হচ্ছে। অর্থাৎ এর দ্বারা আশা করা যায় যে, শুষ্ক এলাকায় সেচ ব্যবস্থা আরো বেশী করে সম্প্রসারিত হবে। তবে এটা ঠিক, সমস্ত রকমের

চেষ্টা সত্ত্বেও দেশের অধিকাংশ এলাকাই বৃষ্টি নির্ভরশীল থাকবে। সুতরাং **জলের এই অবরোধ দূর করার একমাত্র সম্ভাব্য পথ হ'ল—**

(ক) **রসের সংরক্ষণ,**

(খ) **জল সংগ্রহ** এবং তার **পূর্ণ ব্যবহার।**

আমাদের দেশের **লাল** ও কালো মাটিতে বিগত 10 বৎসর ধরে রস সংরক্ষণ ও বৃষ্টির জলের পরিচর্য্যা বিষয়ে অনেক কলাকৌশলের উন্নতি ঘটেছে। দেখা গেছে, এইসব কৌশল যদি যথাযথ ব্যবহার করা যায়, তাহলে তাদের দ্বারা গড়িয়ে যাওয়া জলের অপচয়, মাটির ক্ষয় অনেক কমবে এবং জমির উৎপাদিকা শক্তি অনেক বৃদ্ধি পাবে।

ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জলাধার (small watersheds) এবং **চওড়া বাঁধ ও নালা** (Broad bed and furrow বা BBF) নির্মাণ ঐ স্থানের বৃষ্টির জলের ব্যবহার দক্ষতা বৃদ্ধি করবে এবং গড়িয়ে যাওয়া জলকে ছোট ছোট পুকুর বা জলাধারে সংগ্রহ করে তা পুনরায় জীবন-প্রদায়ী সেচের মাধ্যমে ব্যবহার করতে হবে।

গভীর কালোমাটি বা ভার্টিজল্ (vertisol) এলাকায় চওড়া বাঁধ ও নালা পদ্ধতি এবং নতুন প্রযুক্তিবিদ্যার নিবিড় পরীক্ষাক্ষেত্র দেশের প্রায় 28 মিলিয়ন হেক্টার শস্য এলাকায় নির্মাণ করা হয়েছে। প্রায় 12 মিলিয়ন হেক্টার জমি মধ্যপ্রদেশ, মহারাষ্ট্র ও অন্ধ্রপ্রদেশ মৌসুমী ঋতুতে শস্যচাষহীন অবস্থায় থাকে। প্রায় বিনা সেচে বর্তমান ফসল 500—800 কেজি/হে. থেকে 4000 কেজি/হেক্টার বা আরো বেশী ফসল উৎপন্ন করে। এরূপ জলের সংরক্ষণ ব্যবস্থাকে নানাভাবে পুনর্গঠন করে কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি করা সম্ভব। কিন্তু **জল সংরক্ষণের এইসব ব্যবস্থার সাথে সাথে রাসায়নিক সারের ব্যবহার ও উচ্চফলনশীল জাত এবং তাদের সুপরিচর্যার কলাকৌশল বিষয়ে আমাদের অবশ্যই চিন্তাভাবনা করতে হবে।** দেশের শুধু এই 28 মিলিয়ান হেক্টার গভীর কালোমাটির জন্যই সম্ভবত 2·8 মিলিয়ন টন খাদ্য উপাদান দরকার। বর্তমানে এর একটা অংশমাত্র এই এলাকায় ব্যবহৃত হচ্ছে। দেশের এই 750—1250 মিমি. বৃষ্টিপাতযুক্ত শুষ্ক গভীর কালো মাটি অঞ্চলে BBF পদ্ধতির কলাকৌশল চালু করার জন্য ICRISAT, ICAR এবং বিশ্ববিদ্যালয়গুলি একটি যৌথ পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে। আশা করা যায়, এতে অনেক জমি রসের পীড়ন থেকে রক্ষা পেয়ে সামগ্রিক উৎপাদন বৃদ্ধি করতে সমর্থ হবে।

এ্যালফিসলস মৃত্তিকা অঞ্চলে (Alfisols) গড়িয়ে যাওয়া জলের সংগ্রহ ও পূর্ণ ব্যবহার খুবই বেশী করে সম্ভব। এতে অনেক শুষ্ক এলাকার সামগ্রিক উৎপাদন এই পদ্ধতিতে জল সংরক্ষণ করলে আরো বৃদ্ধি পাবে ও উৎপাদনের একটা স্থিতিশীল অবস্থায় পেঁছানো সম্ভব হবে। এ্যালুভিয়াল মৃত্তিকা অঞ্চলে অনুরূপ অবস্থায় বৃষ্টির জলের সুপরিচর্যা করে বৃষ্টিনির্ভরশীল এলাকার কৃষির আমূল পরিবর্তন করা সম্ভব। সুতরাং জলের প্রাপ্যতা উৎসেচক (catalyst) হিসাবে কাজ করে শুষ্ক এলাকার কৃষি পদ্ধতিকে এইভাবে আমূল পরিবর্তন ঘটাতে সক্ষম।

(খ) খাদ্য উপাদান অবরোধ বা পীড়ন (Nutrient stress) ঃ

শুষ্ক এলাকার চাষবাসে উদ্ভিদ খাদ্য পীড়ন বা অবরোধ একটি মারাত্মক ক্ষতিকর কারণ। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত এখনো পর্যন্ত এর গুরুত্ব সম্বন্ধে ব্যাপকভাবে শুষ্ক এলাকার কৃষকরা ভালভাবে সচেতন নয়।

যদি কেউ শুষ্ক বা খরাপ্রবণ এলাকায় সেচবিহীন অবস্থায় উৎপাদন বাড়াতে চায়, তাহলে একমাত্র উদ্ভিদ খাদ্য উপাদান অবরোধ দূর করলেই তা সম্ভব হবে। যথেষ্ট জৈবসার ব্যবহার করলে মাটির ভৌত অবস্থার উন্নতি ঘটবে এবং তা মাটিতে রস সংরক্ষণে ও উপযুক্ত শস্য পদ্ধতি অনুসরণে সাহায্য করবে। তাই জৈবসার সহ শুষ্ক এলাকার মাটিতে সুষম সার ব্যবহারে উৎপাদন অনেক গুণ বৃদ্ধি করা সম্ভব। জল বাদ দিলে শুষ্ক এলাকায় কম উৎপাদনের মূল কারণ হল, মাটিতে খাদ্য-উপাদানের ঘাটতি। এর মধ্যে **নাইট্রোজেন খাদ্যের অভাব** সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ। ঘোষ ও হাসান (1979) সাম্প্রতিক এক সমীক্ষা থেকে দেখিয়েছেন যে, দেশের প্রায় 65% এর বেশী জমিতে নাইট্রোজেনের পরিমাণ খুবই কম। সম্ভবত শুষ্ক অঞ্চলে এই ঘাটতি সর্বাপেক্ষা বেশী প্রকট। কালো মাটি, লাল মাটি এবং ল্যাটেরাইট মাটিতে [যাকে আধুনিক মৃত্তিকা বিজ্ঞানীরা (soil taxonomists) **ভার্টিজল** (vertisols), **এ্যালফিজলস্** (Alfisols) এবং **অক্সিজলস্** (Oxisols) প্রভৃতি বলে থাকেন] ফসফরাস খাদ্যের ঘাটতি খুবই স্পষ্টভাবে দেখা যায়। এইসব মাটিতে অনুখাদ্য (micronutrients) যথা—জিংক বা দস্তার ঘাটতি খুবই প্রকট। হায়দ্রাবাদের 1400 হেক্টার ICRISAT ফার্মের অধিকাংশ ভার্টিজল ও এ্যালফিজল মাটিতে নাইট্রোজেন, ফসফরাস ও জিংক বা দস্তার পরিমাণ বেশ কম দেখা যায়। এগুলির অনেকাংশ প্রায় 1000 কেজি ফসফেট

জাতীয় সার গত 8 বছর ধরে প্রয়োগ করে ও গ্রহণযোগ্য ফসফরাসের মান **মাঝারি মাত্রায়** আনা সম্ভব হয় নি। এমন কি, এখনো পর্যন্ত 75% ভার্টিজল মাঠের মাটি পরীক্ষা করে ফসফরাসের পরিমাণ নিম্ন এবং 9% মাত্র নিম্ন থেকে মাঝারি মাত্রায় পাওয়া গেছে। অনুরূপভাবে 90% এ্যালফিজল্ মাঠের মাটি পরীক্ষা করে নিম্ন থেকে মাঝারি মাত্রায় ফসফরাস খাদ্য উপাদান পাওয়া গেছে। সুতরাং, এর থেকে আমাদের এটা স্পষ্টভাবে জানতে হবে যে, ভাল ফসল পেতে হলে এইসব সমস্যাবহুল শুষ্ক এলাকায় বছরের পর বছর অবশ্যই ফসফেট জাতীয় সার ব্যবহার করতে হবে। এছাড়া নির্দিষ্ট মাত্রায় দস্তার প্রয়োগও অপরিহার্য। অর্থাৎ শুষ্ক এলাকার জমিতে মাটি পরীক্ষা করে নির্দিষ্ট পরিমাণে নাইট্রোজেন, ফসফেট এবং দস্তার প্রয়োগে ভাল ফসল পাওয়া যাবে।

এইসব অনুর্বর এলাকায় আর একটা সমস্যা হ'ল, কতকগুলি বিশেষ রোগের প্রভাব। বিশেষ করে **বাজরার চারকোল পচা** (charcoal rot) এবং **স্ট্রাইগা** (striga) রোগ খুবই প্রকটভাবে দেখা যায়। রসের পীড়ন ও খাদ্য-উপাদান পীড়ন দূরীকরণের পারস্পরিক ক্রিয়ায় খুব ভাল ফল দেখা যায়। তবে রসের পীড়ন থাকা সত্ত্বেও যদি যথেষ্ট পরিমাণ উদ্ভিদ খাদ্য রাসায়নিক সার তথা জৈবসারের মাধ্যমে জমিতে যোগান দেওয়া যায়, তাহলেও উৎপাদন যথেষ্ট পরিমাণে বৃদ্ধি পাবে। তাই শুষ্ক, অর্দ্ধ শুষ্ক তথা খরাপ্রবণ এলাকার মতো বৃষ্টি নির্ভর অঞ্চলে কেবলমাত্র **সুষম সার ব্যবহার শস্যোৎপাদনের একটি প্রধান গুরুত্বপূর্ণ বিষয়।**

(৩) প্রযুক্তিগত সমস্যা বা বাধা (Technological Problems) :

বৃষ্টি-নির্ভরশীল চাষবাস নিয়ে বিগত দিনে পরিকল্পকরা এবং গবেষকরা খুবই অবহেলা করেছেন। এমনকি কৃষকরা পর্যন্ত তাদের বৃষ্টি-নির্ভরশীল জমিতে চাষবাসের কোনরূপ ঝুঁকি না নিয়ে যে সব জমি সেচযুক্ত, তাতে চাষবাসে বিশেষ মনোযোগ দিয়েছেন। স্বভাবতই তারা শুষ্ক বৃষ্টি নির্ভরশীল এলাকায় উন্নত প্রযুক্তিবিদ্যা এমনকি সার ব্যবহারের কথা আগে কোনরূপ ভেবে দেখার পর্যন্ত চেষ্টা করেনি।

আমাদের ভারতবর্ষে আজ থেকে মাত্র 15 বছর আগে বৃষ্টি নির্ভর চাষবাসের উপর গবেষকরা বিশেষ নজর দিতে শুরু করেন। **অসেচ** বা **বৃষ্টি নির্ভরশীল**

এলাকায় সেচ এলাকার কৃষি প্রযুক্তি ব্যবহারের অনেক প্রযুক্তিগত বাধা রয়েছে। এদের কয়েকটি নিম্নরূপ—

(ক) শুষ্ক অসেচ এলাকার জন্য বিভিন্ন ফসলের সঠিক জাতের অভাব, বিশেষ করে যেগুলো সর্বোচ্চ ফলনের গ্যারাণ্টি দেবার ক্ষমতা রাখে।

(খ) বিভিন্ন ফসলের অধিকতর সার সহনশীল জাতের অভাব, বিশেষ করে ডাল শস্য ও তৈলবীজ জাতীয় শস্যের।

(গ) বর্তমান শস্য পদ্ধতির থেকে অধিকতর লাভজনক শস্য পদ্ধতির অভাব।

(ঘ) বৃষ্টি নির্ভরশীল চাষের সাথী ফসলে বিভিন্ন রোগ পোকার সমস্যাবলী একক শস্য চাষ পদ্ধতি অপেক্ষা সম্পূর্ণ আলাদা এবং এদের নিয়ে যথেষ্ট গবেষণা এখনও হয়নি। তাছাড়া শুষ্ক এলাকার চাষীদের কাছে বৃহত্তর ঝুঁকি এবং স্বল্পতর ফলনের জন্য এ বিষয়ে কোন আগ্রহ জন্মানো যায় নি।

(ঙ) শুষ্ক এলাকার চাষবাসে আগাছা একটি সাংঘাতিক ক্ষতিকর সমস্যা এবং এখনো এইসব জায়গায় আগাছা পরিচর্যার সুষ্ঠু প্রযুক্তিবিদ্যা চাষীদের কাছে সঠিকভাবে পোঁছায়নি, যা গবেষকদের কাছে তা ব্যাপক গবেষণার দাবী রাখে। এইসব আগাছা শস্যের জন্য বরাদ্দ বহুমূল্য জল এবং খাদ্য-উপাদানে ভাগ বসায় এবং এদের পীড়ন বৃদ্ধি করে। এমনকি আগাছার দৌরাত্মে সার ব্যবহারের দক্ষতা বৃদ্ধি পায় না।

(চ) বৃষ্টি নির্ভরশীল শুষ্ক এলাকায় চাষবাসের বিভিন্ন উপাদান সঠিকভাবে সঠিক সময়ে পোঁছায় না বলে কৃষকরা সাধারণভাবে প্রায়শ নালিশ করে থাকেন। এছাড়া, এইসব সমস্যাবহুল এলাকায় একই সাথে মাটির যথোপযুক্ত গভীরতায় বীজ এবং সার ব্যবহারের সহজতম অথচ কম খরচে নির্মিত যন্ত্রপাতির খুবই অভাব দেখা যায়। ফলে ভালভাবে অঙ্কুরোদ্গম হয় না এবং গাছের সংখ্যাও হ্রাস পায় এবং স্বভাবতই ফসল উৎপাদন খুব কম হয়।

(ছ) এছাড়া যে সব সহজতম কমদামী যন্ত্রপাতি কৃষি-যন্ত্রীবদরা এ পর্যন্ত উদ্ভাবন করেছেন, তা ব্যাপকভাবে কৃষকদের কাছে এখনো ব্যাপক সম্প্রসারিত হতে পারেনি। কিংবা কোন সংস্থা এই সব যন্ত্রপাতির ব্যাপক উৎপাদন অথবা পরীক্ষা ক্ষেত্র গড়ে তুলতে সক্ষম হয়নি। সার ব্যবহার করা এইসব এলাকায় একটি বিরাট সমস্যা। তাই দেশী লাঙ্গলের সঙ্গে সামান্য প্রযুক্তিগত বিদ্যা খাটিয়ে এই সার ব্যবহারের সম্প্রসারণ সহজেই করা সম্ভব।

(৪) সামাজিক—অর্থনৈতিক অবরোধ :

মূলধনের অভাব, শুষ্ক এলাকার ফসলের উৎপাদনকারী কৃষকদের ঠিকমত **উৎসাহপ্রদ দামের** অভাব, বাজারের সুযোগ-সুবিধা, ঋণের ব্যবস্থা প্রভৃতি অন্যান্য অনেক সামাজিক অর্থনৈতিক বাধা শুষ্ক এলাকার কৃষকদের **মনোভাবের** অবস্থা ও **মনোবলকে** যথেষ্টভাবে প্রভাবিত করে। এসব অঞ্চলের প্রায় সব কৃষকরাই কোনরকমভাবে জীবিকা পালন করে থাকে একথা আগেও বলা হয়েছে। সারা বছরে সেচ এলাকার কৃষকদের ন্যায় তাদের নিয়মিত কোন আয়ের সুযোগ বা গ্যারাণ্টি নাই।

এইসব সামাজিক তথা অর্থনৈতিক বাধা শুষ্ক এলাকার কৃষকদের কাছে এক বড় বাধা। অবশ্য একথা ঠিক যে, আজ যেখানে শুষ্ক এলাকার চাষবাসের প্রযুক্তিবিদ্যা সহজলভ্য, উপরোক্ত সামাজিক তথা অর্থনৈতিক বাধা শস্য উৎপাদনে সেখানে একটা বিরাট সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে।

তাই সরকার এবং সমস্ত সম্প্রসারণ কর্মী তথা কৃষককুলকে ধীরে ধীরে এইসব সমস্যা কাটিয়ে ওঠার জন্য সর্বান্তকরণে চেষ্টা চালাতে হবে। আমাদের মত উন্নয়নশীল দেশে সবসময় সমস্যার পাহাড়কে সামনে দাঁড় করিয়ে রেখে মাথায় হাত দিয়ে বসলে চলবে না। হাতের কাছে যা সম্বল আছে, তাকে কাজে লাগিয়ে একযোগে সবাইকে কাজে আত্মনিয়োগ করতে হবে। সমস্ত প্রকার প্রাচীন প্রথা, প্রাচীন প্রযুক্তিবিদ্যা, জীবিকা-চাষ, সাথী ফসলচাষ পদ্ধতি, পাতলা ঘনত্বে বীজবোনা বা গাছ লাগান প্রভৃতি বিসর্জন দিতে হবে। তা না হলে ফলনের উপর খুবই খারাপ প্রভাব পড়বে।

শুষ্ক এলাকার কৃষকদের আধুনিক প্রযুক্তিবিদ্যা গ্রহণের সঙ্গে সঙ্গে অন্যান্য উপজীবিকা, যথা—উন্নতজাতের ছাগল, ভেড়া, মুরগী প্রভৃতির চাষ, শূকর পালন, মৌমাছি চাষ প্রভৃতি ভালভাবে শিখতে হবে। এতে চাষবাসের অসময়ের বেকারত্ব দূর হবে এবং চাষবাসের মন্দা সময়ে সাহায্যকারী জীবিকা হিসাবে কৃষক পরিবারকে অনেকটা সামর্থ্য ও সাহায্য যোগাবে।

প্রতিকার ব্যবস্থা

শুষ্ক এলাকার চাষবাসে উপরোক্ত সব বাধা কাটিয়ে উঠে কৃষকরা যাতে অধিকতর শস্য উৎপাদন করতে পারে সেজন্য আমাদের যৌথভাবে একটা কর্মপন্থা গ্রহণ করতে হবে।

এটা স্বীকার করতেই হবে যে, যে কোন শুষ্ক এলাকার কৃষকদের কাছে এইসব উপরে বর্ণিত বাধা দূর করে দিতে পারলে খুবই একটা আদর্শ পরিবেশের সৃষ্টি হবে। কিন্তু এইসব বাধা বা অবরোধ কখনোই একসাথে দূর করা সম্ভব নয়। এদের মধ্যে কিছু অবশ্যই দূর করা সম্ভব এবং যে গুলো শস্য উৎপাদনে প্রধান বাধা, সেগুলোকে সর্বপ্রথম দূর করার চেষ্টা করতে হবে। সেজন্য সবদিক বিচার ভাবনা করে আমাদের একটি কর্মপদ্ধতি গ্রহণ করতে হবে।

এর মধ্যে মূলত **মাটির রস, উদ্ভিদ খাদ্য উপাদান** এবং **শস্য**—এই তিনটি চাবিকাঠির উপর বিশেষ জোর দিতে হবে। তবেই শুষ্ক এলাকার কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি পাবে। একমাত্র সুষম সার ব্যবহারেই কয়েকগুণ কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি সম্ভব, তা আগেই বলেছি। সুতরাং শুষ্ক এলাকার চাষবাসে সর্বাগ্রে সুষম সার ব্যবহার বিষয়ে বিশেষ যত্নবান হতে হবে।

পঞ্চম অধ্যায়

শুষ্ক এলাকার চাষবাসে সারের ব্যবহার

(Fertilizer use in Dryland Agriculture)

সার ব্যবহার চিত্র-সমস্যা, সম্ভাবনা ও প্রত্যাশা ঃ

ষষ্ঠ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার শেষে (1985-86) সার ব্যবহারের লক্ষ্যমাত্রা আমাদের দেশে মোট সার ব্যবহার পরিমাণের 5·3 থেকে 8·9 মিলিয়ন টনে বৃদ্ধি পেয়েছে। এই পরিকল্পনাকালীন সময়ে সেচ এলাকা দ্বিগুণ করে উচ্চফলনশীল শস্যচাষের এলাকা বৃদ্ধি করা হবে বলে ধরা হয়েছিল। কিন্তু এই লক্ষ্যমাত্রায় পোঁছান সম্ভব হতো, যদি বিশাল এই শুষ্ক এলাকার চাষবাসে একমাত্র কারণ সারের ব্যবহার লক্ষ্যণীয়ভাবে বৃদ্ধি করা যোতো। অর্থাৎ সার ব্যবহার শুষ্ক এলাকার চাষবাসে অধিকতর শস্য উৎপাদনের প্রধান **চাবিকাঠি**।

বর্তমানে ভারতবর্ষের শুষ্ক এলাকায় সার ব্যবহার চিত্র পর্যালোচনা করা যাক। আমাদের মোট সার ব্যবহারের চিত্রে দেখা যায় যে, খরিফ মরসুমের চাষবাস হয় 70% শস্য এলাকায় এবং তা দেশের অধিকাংশ শুষ্ক এলাকার চাষবাসের এলাকায়। এতে খরিফ মরসুমে মোট সার ব্যবহার হয় দেশের সারা বছরের মোট ব্যবহৃত সারের 40%। 60% সার ব্যবহৃত হয় **রবি** মরসুমে এবং তা মাত্র 30% শস্য এলাকার চাষবাসে। এই ছবির দিকে পৃথকভাবে তাকিয়ে দেখলে দেখা যাবে যে, যেখানে প্রায় 4 মিলিয়ন টনের ও বেশী খাদ্য উপাদান আর্থিক শস্য (cash crops), সেচযুক্ত ফসল (যেমন—গম, ধান, আখ, তুলা) প্রভৃতিতে ব্যবহৃত হয়, সেখানে মাত্র 1 মিলিয়ন টন বা তার কম খাদ্য উপাদান শুষ্ক এলাকার চাষবাসের 100 মিলিয়ন হেক্টার জমিতে ব্যবহৃত হয়।

ঝা এবং সারিন (1980) ভারতবর্ষের শুষ্ক এলাকায় সার ব্যবহারের উপর একটি নিবিড় সমীক্ষা চালিয়ে দেখেছেন যে, 112টি অসেচ শুষ্ক প্রধান জেলায় হেক্টার প্রতি গড় সার ব্যবহারের পরিমাণ 10 কেজি/হে. থেকে কিছুটা বেশী, যদিও এইসব এলাকায় মূলত সার ব্যবহার হয় তুলা, চীনাবাদাম, লংকা, তামাক এবং উচ্চফলনশীল জাতের দানাদার শস্য চাষে। কম সার ব্যবহার করা জেলাগুলি

সাধারণত মধ্যপ্রদেশ, মহারাষ্ট্র, রাজস্থান এবং গুজরাট রাজ্যে বেশী করে অবস্থিত। এই রাজ্য গুলিতেই দেশের সর্বোচ্চ শুষ্ক এলাকা রয়েছে।

ঝা প্রভৃতি অন্যান্যরা (1981) বলেছেন যে, বেশীর ভাগ শুষ্ক এলাকার কৃষকরা অসেচ অবস্থায় সেচ এলাকার ন্যায় সার ব্যবহার করে **বাজরা** ও **মিলেটের** উচ্চফলনশীল জাতের চাষ করেছিল, এবং তাতে ভাল ফসলও পেয়েছিল। বাজরা থেকে জোয়ার চাষের শুষ্ক জেলাগুলিতে সার ব্যবহারের এই সুফল অধিকতরভাবে প্রচারিত হয়েছিল। এঁরা দেখিয়েছেন যে, উচ্চ ফলনশীল জাতের বাজরা চাষে নাইট্রোজেন (N) ও ফসফেট (P_2O_5) সারে 21—40, 21—30 এবং 11—20 কেজি/হে. ও উচ্চফলনশীল বাজরা চাষে 21—40 কেজি/হে. নাইট্রোজেন—ফসফেট ঘটিত সার ব্যবহারে সুফল পাওয়া গেছে। সেচ যুক্ত চাষে এই সারগুলির ব্যবহারের পরিমাণ দ্বিগুণ করে দেওয়া হয়। এই চিত্র থেকে এটা পরিষ্কার বোঝা যায়, বৃষ্টি নির্ভর শুষ্ক এলাকায় কৃষকরা সার ব্যবহার করে উৎপাদন বৃদ্ধি হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সার ব্যবহারের গুরুত্ব সম্বন্ধে উপলব্ধি করতে পারছেন। সুতরাং শুষ্ক এলাকায় সারের ব্যবহার বাড়াতে হলে উচ্চফলনশীল চাষবাসের এলাকাও বৃদ্ধি করতে হবে।

দানা শস্যের মধ্যে জোয়ার, বাজরা, মিলেট, ভুট্টা (বা জোনার বা মকাই) এবং গমের উচ্চফলনশীল ভাল জাত আজ শুষ্ক এলাকার কৃষকদের কাছেও সহজলভ্য। ডালশস্যের মধ্যে অড়হর, ছোলা, মুগ এবং বীন প্রভৃতি অসেচ শুষ্ক এলাকার উপযোগী উন্নতজাত আজ কৃষকদের কাছে সহজলভ্য। তবে এইসব শস্যের উচ্চসার সহনশীলজাত এখনো না বেরুনোয় সারের ব্যবহার আরো বৃদ্ধি করা সম্ভব হচ্ছে না। পশ্চিমবঙ্গের জন্য উপযুক্ত উন্নতজাতের ডালশস্য ও তৈলবীজশস্য বহরমপুর ডাল ও তৈলবীজ গবেষণাকেন্দ্র থেকে সরাসরি এ রাজ্যের কৃষকরা পেতে পারেন। এগুলি মাঝারি সার মাত্রায় আর্থিক ফলন দেয়। তৈলবীজের মধ্যে চীনাবাদাম, সয়াবীন, রেপসরিষা প্রভৃতির উন্নত জাত ও তাদের সার ব্যবহার চিত্র ডালশস্যের ন্যায়। এদের অধিক ফলনের জন্য সার ব্যবহার বৃদ্ধি অবশ্যই কর্তব্য। রাইজোবিয়াম জীবাণু সার (Rhizobium culture) এইসব ডালশস্য ও তৈলবীজ শস্যচাষে কিছুটা নাইট্রোজেনঘটিত খাদ্য উপাদানের চাহিদা যোগানে সাহায্য করে।

বিভিন্ন এলাকার কৃষি খামার, কৃষি বিদ্যালয় ও ব্লক স্তরের কৃষি উন্নয়ন

আধিকারিক (ADO) / মহকুমা কৃষি আধিকারিক (SAO) / জেলার মুখ্য কৃষি আধিকারিক (PAO) / হিন্দুস্থান সার সংস্থার সার সম্প্রসারণ ও কৃষি গবেষণা কেন্দ্রের কৃষিবিদ্ প্রভৃতিও অন্যান্য কৃষি সংস্থার সম্প্রসারণ কর্মীদের কাছ থেকে কৃষকরা চাষবাস বিষয়ে বিস্তৃত তথ্য বা জ্ঞাতব্য বিষয় সম্বন্ধে সব খবরাখবর সহজেই পেতে পারেন।

অতীতকালে উচ্চফলনশীল জাতগুলি মূলত সেচ এলাকাতেই অধিক পরিমাণে সম্প্রসারিত হয়েছিল, যেমন ধান এবং গমের ক্ষেত্রে। তবে জোয়ার ও বাজরার ক্ষেত্রে এদের উচ্চফলনশীল জাতগুলি মহারাষ্ট্র, মধ্যপ্রদেশ এবং অন্ধ্রপ্রদেশের বৃষ্টিনির্ভর শুষ্ক অঞ্চলে ভালভাবে সম্প্রসারিত হয়েছে বা অন্যান্য শুষ্ক সেচ বিহীন খরাপ্রবণ এলাকাতেও সম্প্রসারিত হচ্ছে। গুজরাট, পাঞ্জাব এবং হরিয়ানাতে জোয়ারের উচ্চফলনশীল জাতগুলি ভালভাবে সম্প্রসারিত হয়েছে। কিন্তু তৈলবীজ ও ডালশস্যের ক্ষেত্রে এদের উচ্চফলনশীল জাতগুলির অনুরূপভাবে এখনো পর্যন্ত সম্প্রসারণ আদৌ ঘটেনি। এরজন্য সরকারী, বেসরকারী তথা বিভিন্ন সংস্থার ব্যাপক সম্প্রসারণ কর্মসূচী নেওয়া কর্তব্য। পাঞ্জাব, হরিয়ানা, উত্তরপ্রদেশ, বিহার, গুজরাট এবং অন্ধ্রপ্রদেশে তৈলবীজ ও ডালশস্যের উচ্চ-ফলনশীল জাতের ব্যাপক সম্প্রসারণ কাজকর্ম চলছে। আশা করা যায়, অদূর ভবিষ্যতে দেশের সমস্ত রাজ্যে, বিশেষ করে বৃষ্টি নির্ভরশীল চাষবাসের এলাকায় এদের ব্যাপক চাষ সুরু হবে। এর জন্য শুষ্ক এলাকার চাষবাসে জৈব পদার্থ এবং সবুজ সার ব্যবহার ও শস্য পর্যায়ে শিম্বি গোত্রীয় ফসল চাষের অন্তর্ভুক্তিসহ ফসফেট সার ও নির্দিষ্ট জীবাণু সার ব্যবহার অবশ্যই চাষবাস পরিকল্পনায় একটি মুখ্য অংশরূপে গণ্য হবে। অতীতে এই অংশ দুর্ভাগ্যবশতঃ ছিল না বললেই হয়।

শুষ্ক এলাকার সুষ্ঠ কৃষি সম্প্রসারণ কর্মসূচীতে তাই উচ্চফলনশীল বীজ, সার এবং মাটি ও বৃষ্টির জলের সুষ্ঠু পরিচর্যার একসঙ্গে একটা সমন্বয় পদ্ধতি রেখে চাষবাসে হাত দিতে হবে।

খরিফ মরসুমে কম সার ব্যবহারের কারণ (Factors accounted for low consumption of fertilizers in kharif season) ঃ

খরিফ শস্য চাষে কম সার ব্যবহারের কতকগুলি সম্ভাব্য কারণ নীচে দেওয়া হ'ল। যদি আমরা খরিফ মরসুমে সার ব্যবহার বাড়াতে সমর্থ না হই, তাহলে

আগামী 5 বছরেও আমরা সার ব্যবহারের লক্ষ্য মাত্রায় পৌঁছাতে পারব না। বর্ষাকালের চাষে কম সার ব্যবহারের কারণগুলি কিছুটা এই সবের জন্য দায়ী, যথা—

(1) দেশের বিশাল এলাকাতেই বৃষ্টি নির্ভরশীল শস্য চাষ হয়ে থাকে। এতে বৃহত্তর ঝুঁকি এবং কম উৎপাদন পাওয়া যায়।

(2) বৃষ্টি নির্ভর ধান চাষের এলাকা অনেক বেশী। এতে জলের কোন প্রকার নিয়ন্ত্রণ থাকে না। ফলে নাইট্রোজেন ঘটিত সার ব্যবহারের দক্ষতা খুবই কম। এটা বলা খুবই সমীচীন হবে যে, যতক্ষণ পর্যন্ত না আসাম, বিহার, পশ্চিমবঙ্গ, উড়িষ্যা এবং মধ্যপ্রদেশের বৃষ্টি নির্ভর ধান চাষের এলাকায় খরিফ মরসুমে সারের ব্যবহার বাড়ছে, ততক্ষণ পর্যন্ত সামগ্রিক সার ব্যবহারের লক্ষ্যমাত্রা বৃদ্ধি পাবে না।

(3) খরিফ মরসুমে রবি মরসুম অপেক্ষা উদ্ভিদ খাদ্য খুব কম পরিমাণে পুনঃ প্রাপ্তি ঘটে।

(4) অধিক রস বা জলের আধিক্যে এই মরসুমে খুব বেশী আগাছার উপদ্রব হয় এবং স্বভাবতই সারের দক্ষতা হ্রাস পায়।

(5) অধিক আর্দ্রতা, মেঘলা আবহাওয়া প্রভৃতির জন্য খরিফ মরসুমে অধিক রোগ-পোকার প্রাদুর্ভাব হয়।

(6) আগে থেকে মাটি পরীক্ষা না করে অসম সার ব্যবহার করার ফলে সীমিত খাদ্য উপাদানের দরুণ ব্যবহৃত সারের দক্ষতা হ্রাস পায়।

(7) সঠিক সময়ে সঠিক হারে সঠিক গভীরতায় সার ব্যবহারের জন্য উপযুক্ত কৃষি যন্ত্রপাতির অভাব।

(8) সময়মত ঋণ ও সারের সহজ লভ্যতার অভাব।

(9) শস্য ও মাটির চাহিদা অনুযায়ী মাটিতে রসের স্থিতি ও সারের চাহিদা নির্ণয় বিষয়ে যথেষ্ট তথ্যের অভাব।

(10) শুষ্ক এলাকার চাষে জলই কেবল মাত্র যথেষ্ট নয়। এটি মাটি ও বৃষ্টির জলের যৌথ পরিচর্যা এবং সার ও শস্যের পরিচর্যার মিলিত ফল—এই ধারণার যথেষ্ট অভাব এখনো সাধারণ কৃষকদের মধ্যে বর্তমান।

শুষ্ক, অর্দ্ধ-শুষ্ক গ্রীষ্মমণ্ডলীয় অঞ্চল ও খরাপ্রবণ এলাকায় সার ব্যবহারের সম্ভাবনা এবং প্রত্যাশা (Potentials and Prospects of

Fertilizer use in Arid & Semi-arid Tropics and Drought-prone Areas)

এ পর্যন্ত ভারতবর্ষের বিভিন্ন রাজ্যের বৃষ্টি-নির্ভর শুষ্ক এলাকার চাষবাসে বহুবিধ সমস্যা ও প্রত্যাশা বিষয়ে কিছুটা আলোকপাত করার চেষ্টা হয়েছে। এই সব এলাকায় উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য এখন অনেক নতুন প্রযুক্তিবিদ্যা আমাদের হাতে এসেছে, কিন্তু কিভাবে মাটি ও বৃষ্টির জলের পরিচর্যা, উচ্চফলনশীল জাতের শস্যচাষ ও দক্ষভাবে সার ব্যবহার হবে, তার একটি সর্বসমন্বিত কার্যধারা আবশ্যক। শুষ্ক এলাকায় 3·5 গুণ বেশী খাদ্য উৎপাদন সম্ভব এবং এর বেশী সুফল পাওয়া যাবে কেবলমাত্র **দক্ষ সুষম সার ব্যবহার থেকে।** কিন্তু কৃষকদের সম্ভাবনা ও বেশী লাভ পাওয়া প্রভৃতি বিষয়কে ভালভাবে বোঝাতে হবে। তাদের কাছে রসের পীড়ন, খাদ্য-উপাদানের পীড়ন দূরীকরণ এবং পরিবেশগত সম্ভাবনাকে কাজে লাগিয়ে এই সবের একটি সম্যক কার্যধারা গড়ে তুলতে হবে।

এতে ভারতবর্ষের এমনকি 12 মিলিয়ন হেক্টর গভীর কালো মাটিতেও বছরে 36 মিলিয়ন টন খাদ্য উৎপাদন করা যাবে। কিন্তু এতে অনেক নাইট্রোজেন, ফসফরাস প্রভৃতি খাদ্যপ্রাণজনিত সারের প্রয়োজন হবে। লাল, এ্যালুভিয়াল এবং ল্যাটেরাইট মাটিতেও একই অবস্থা। এইসব মাটিতেও শুষ্ক অবস্থায় সন্তোষজনক শস্য উৎপাদনের জন্য অনেক টন উদ্ভিদ খাদ্য ঢালতে হবে।

ভারতের এই বিশাল 100 মিলিয়ন হেক্টর বৃষ্টি-নির্ভর এলাকায় শস্য চাষের দারুন সম্ভাবনা রয়েছে এবং এখনো প্রযুক্তি বিদ্যাকে ঠিকমতো সব জায়গায় কাজে লাগানো যায় নি। এখন এইসব এলাকায় সম্ভাব্য উৎপাদনের মাত্র এক পঞ্চমাংশ উৎপাদিত হচ্ছে। এমনকি হেক্টর প্রতি বছরে 20 কে. জি. খাদ্য উপাদান ব্যবহারেও গড়ে বছরে 2 মিলিয়ন টন খাদ্যপ্রাণ বা রাসায়নিক তথা জৈবসার ব্যবহার করা যাবে। এতে 60 মিলিয়ন টনেরও বেশী খাদ্যশস্য উৎপাদন সম্ভব হবে। এই সার ব্যবহার যদি মাটি ও বৃষ্টির জলের পরিচর্যা, উচ্চফলনশীল জাত ও দক্ষভাবে শস্যের পরিচর্যা প্রভৃতিতে যুক্ত হয়, তাহলে উৎপন্ন অতিরিক্ত খাদ্যের পরিমাণ অনেক গুণ বৃদ্ধি পাবে।

এর জন্য দরকার প্রাচীন চাষপদ্ধতি ও গতানুগতিক জীবিকা থেকে উন্নত আধুনিক কৃষি প্রযুক্তিবিদ্যার অধিগ্রহণ এবং বাজারজাত পরিবেশ ঘিরে চাষ পদ্ধতির প্রণয়ন।

সার ব্যবহারে বিভিন্ন ফলাফলের প্রতিক্রিয়া (Yield Response to Fertilizer Application) :

অধিকাংশ শুষ্ক এলাকায় ফসলে সার ব্যবহারের বিভিন্ন পরীক্ষালব্ধ ফলাফল আজ হাতের কাছে রয়েছে। এইসব পরীক্ষা থেকে এটা স্পষ্টই প্রমাণ হয় যে, সার ব্যবহারে ফলন বাড়ে। নীচের সারণীতে (10নং) ভেংকটেশ্বরলুর (1979) একটি পরীক্ষার ফলাফল দেওয়া হ'ল।

সারণী—10. শুষ্ক এলাকায় সার ব্যবহারের প্রতিক্রিয়া

শস্য	মরসুম	নাইট্রোজেন			ফসফরাস	
		পরীক্ষা ক্ষেত্রের সংখ্যা	সর্বোচ্চ পরিক্ষিত নাইট্রোজেন মাত্রা (কেজি/ হে.)	দানা ফলনের প্রতিক্রিয়া (কেজি/ কেজি নাইট্রোজেন)	পরীক্ষা ক্ষেত্রের সংখ্যা	দানা ফলনের প্রতিক্রিয়া 30—50 কেজি P_2O_5/হে
ধান	খরিফ	17	80	16·1		
ভুট্টা	"	5	80	14·9	5	12·2
জোয়ার	"	9	80	23·8	4	9·0
বাজরা	"	3	80	16·6	4	7·2
গম	রবি	12	50	20·5		
বার্লি বা যব	"	14	40	17·5		
বাজরা	"	8	60	15·0		
সরগুজা	"				3	3·2
সরিষা	"				6	5·7
ছোলা	"				2	10·9

অধিকাংশ বৃষ্টি-নির্ভর শস্যে সার পরীক্ষাক্ষেত্রে নাইট্রোজেনের সঙ্গে ফসফরাস এবং অপেক্ষা কৃত কম সংখ্যক পটাসিয়ামের উপর গবেষণা করা হয়েছে। ভাল বৃদ্ধি অবস্থায় নাইট্রোজেনের সাধারণতঃ সার্বিক প্রতিক্রিয়া পাওয়া গেছে এবং ফসফরাসের প্রতিক্রিয়া যদিও নাইট্রোজেনের মত এত বেশী নয়, তবে তা ভাল ভাবে লক্ষ্য করা গেছে।

উপরের সারণী 10-এ নাইট্রোজেন ব্যবহারে দানা ফলন প্রতিক্রিয়া 15 কেজি দানা / কেজি নাইট্রোজেন থেকে 23·8 কেজি দানা / কেজি নাইট্রোজেন পর্যন্ত

পাওয়া যায়। এইগুলি সেচ এলাকার ফলাফলের সঙ্গে সহজেই তুলনীয় এবং দানা শস্য উৎপাদনের সঙ্গে নাইট্রোজেনের অনুপাত মোটামুটি 10 : 1 বলে দেখা যায়।

ফসফরাস ঘটিত সার ব্যবহারের পরীক্ষাক্ষেত্র যদিও সংখ্যায় কম, তবুও অনেক ক্ষেত্রে এর প্রতিক্রিয়া ভালভাবে পাওয়া গেছে।

বিভিন্ন রিসার্চ ষ্টেশনে পুনরুক্ত পরীক্ষা (replicated experiments) ছাড়া সরাসরি কৃষকদের ক্ষেতে বৃষ্টি নির্ভর অবস্থায় বৃহৎ সংখ্যক পরীক্ষা চালানো হয়েছে। প্রায় 1600 এর বেশী পরীক্ষা ক্ষেত্রে ধান, বাজরা, ভুট্টা, জোয়ার, গম, ছোলা, রেঁড়ি এবং চীনাবাদাম প্রভৃতি শস্যের গড় ফলাফল পর্যালোচনা করা হয়েছে। **সারণী 11**-তে এদের সংক্ষিপ্ত ফলাফল দেওয়া হ'ল এবং চিত্র 11-তে কৃষকদের জমিতে এই সব পরীক্ষাক্ষেত্র সুষম সারের বিক্রিয়া বা সুষম সার ব্যবহারে ফলনের বৃদ্ধি দেখানো হয়েছে।

সারণী 11 : বৃষ্টি নির্ভর অবস্থায় কৃষকদের ক্ষেতে বিভিন্ন সার ব্যবহারজনিত পরীক্ষার ফলাফল

শস্য	পরীক্ষা ক্ষেত্রের সংখ্যা (No of trials)	ফলন (সার-ছাড়া) (কু./হে.)	বিভিন্ন উদ্ভিদখাদ্য ব্যবহারে ফলন বৃদ্ধির পরিমাণ (কু./হে.)		
			নাইট্রোজেন	না. + ফসফেট	না. + ফ. + পটাশ
			(50)	(50+25)	(50+25+25)
ধান	281	10·3	6·2	9·3	10·7
জোয়ার	106	9·7	6·4	10·0	11·3
ভুট্টা	369	11·9	5·9	8·9	9·8
বাজরা	358	7·4	5·2	8·0	9·5
গম	954	9·1	4·8	7·9	8·7
ছোলা	170	6·2	(30) 1·7	(30+60) 4·5	—
রেঁড়ি	56	7·2	(50) 2·8	(50+60) 6·5	(50+50+25) 6·9
চীনাবাদাম	101	10·4	(40) 1·8	(40+80) 4·5	(40+80+40) 5·2

Source : For crops except wheat, Mahapatra, I. C. et al. Fertilizer News, August 1973 ; for wheat, Singh, D. et, al. Agric Situ India 1975. 30 (4), 237—240.
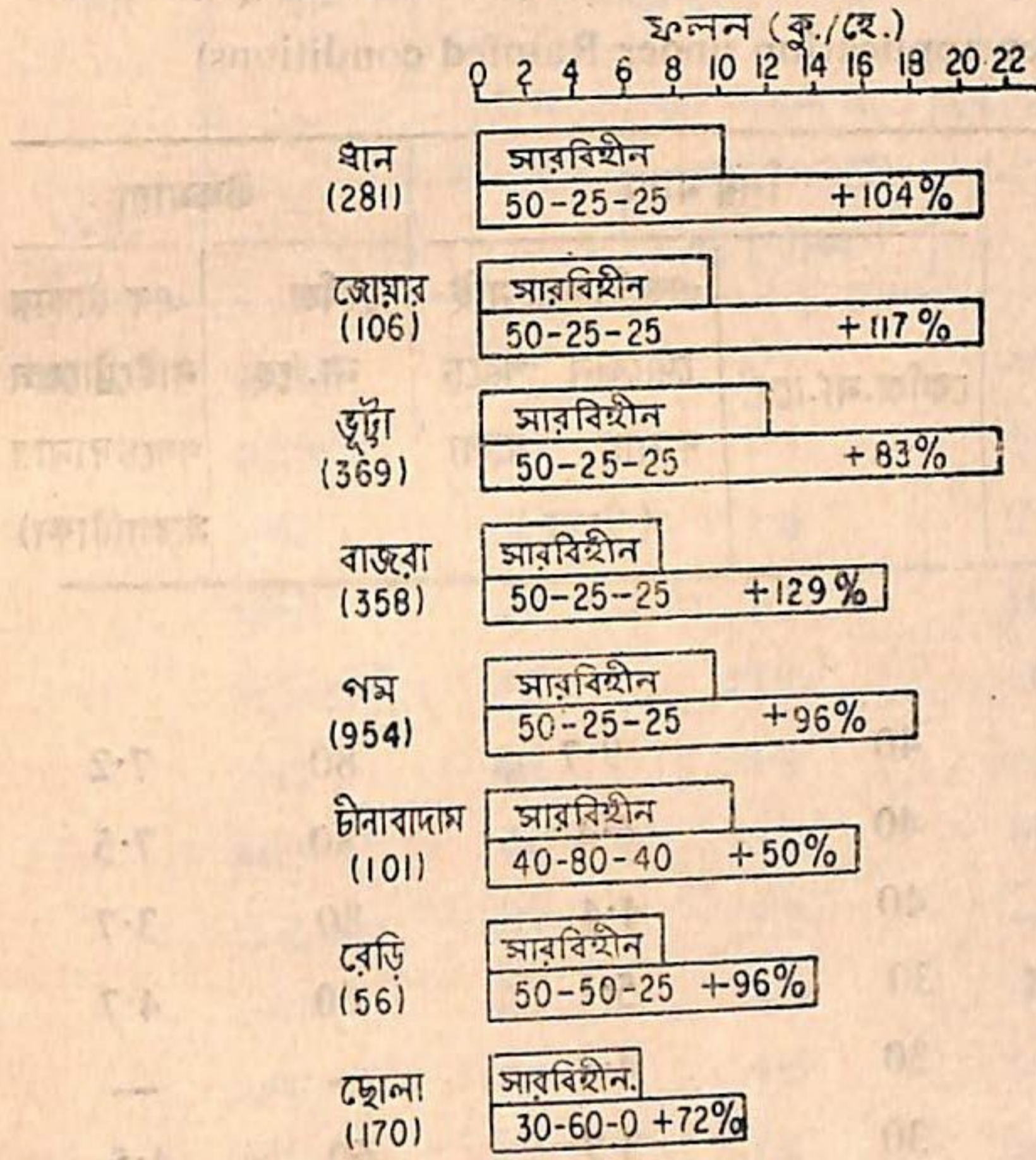
চিত্র 11 : বৃষ্টি নির্ভর এলাকায় সারবিহীন ও সারযুক্ত অবস্থায় বিভিন্ন ফসলের ফলন বৃদ্ধি। ফসলের নীচে বন্ধনীতে মোট পরীক্ষা ক্ষেত্রের সংখ্যা দেওয়া হয়েছে।

সার ব্যবহার বিক্রিয়ার অর্থনীতি (Economics of Fertilizer Response) :

সার ব্যবহারের পর প্রাপ্ত ফলনে একটা প্রশ্ন দেখা দেয়। তাহ'ল, এই প্রাপ্ত ফলনের জন্য সারের ব্যবহার কতটা লাভজনক ? কৃষকদের কাছে এটি একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হওয়া উচিত। তা নাহলে কৃষিকে কখনোই লাভজনক পর্যায়ে উন্নীত করা সম্ভব হবে না।

অপর পৃষ্ঠার **সারণী 12**-তে বৃষ্টি নির্ভর এলাকার বিভিন্ন স্থানে সারের বিক্রিয়ায় (বিশেষ করে নাইট্রোজেন) সঙ্গে প্রতি টাকার নাইট্রোজেন খরচ করে কত মূল্যের দানা শস্য পাওয়া গেছে, তার একটি হিসাব দেওয়া হয়েছে (**চৌধুরী** প্রভৃতি, 1979)।

সারণী 12 : বৃষ্টিনির্ভর এলাকায় সার ব্যবহারে খরচের অনুপাত (Cost Ratio of fertilizer application under Rainfed conditions)

শস্য	স্থান	নিম্ন মাত্রা		উচ্চমাত্রা	
		কেজি.না./হে.	এক টাকার নাইট্রোজেন খরচে দানার মূল্য (টাকা)	কেজি. না./হে.	এক টাকার নাইট্রোজেন খরচে দানার মূল্য(টাকা)
জোয়ার (খরিফ)	আকোলা	40	9·7	80	7·2
	হায়দ্রাবাদ	40	6·4	80	7·5
	ঝাঁসী	40	4·4	80	3·7
ঐ (রবি)	শোলাপুর	30	5·1	60	4·7
	বিজাপুর	30	4·4	—	—
	বেলারী	30	3·7	60	4·5
	কোভিলপট্টী	20	4·3	40	4·0
	যোধপুর	40	4·2	—	—
বাজরা	শোলাপুর	50	4·9	75	4·4
	হিসার	40	3·2	—	—
রাগী	বাঙ্গালোর	25	6·5	50	4·8
ধান	বারাণসী	40	4·8	80	4·2
	ভুবনেশ্বর	30	3·4	60	2·6
	দেরাদুন	40	3·6	80	2·6
	রেওয়া	40	3·9	80	3·0
	রাঁচী	40	4·4	80	3·5
ভুট্টা	দেরাদুন	50	5·5	—	—
	বাঙ্গালোর	50	15·2	75	13·4
	লুধিয়ানা	40	6·0	80	5·7

শস্য	স্থান	নিম্নমাত্রা		উচ্চমাত্রা	
		কেজি না./হে.	এক টাকার না. খরচে দানার মূল্য (টাকা)	কেজি না./হে.	এক টাকার না. খরচে দানার মূল্য (টাকা)
গম	রেওয়া	20	6·7	40	5·6
	দেরাদুন	25	9·1	50	6·4
	সম্বা	50	9·4	75	7·1
	ঝাঁসী	20	3·7	40	3·5
	লুধিয়ানা	40	11·0	80	7·6
	রাঁচী	40	3·9	—	—
	বারাণসী	40	5·0	60	4·8
	ভুবনেশ্বর	20	3·9	—	—
	দেরাদুন	20	4·9	40	4·5
	সম্বা	40	5·5	60	5·3
	বারাণসী	40	7·4	60	6·2
	আগ্রা	40	4·1	60	4·1
সরিষা	ঝাঁসী	20	11·2	40	10·6
	লুধিয়ানা	25	5·2	50	5·4
	আগ্রা	30	3·3	60	3·2
	বারাণসী	40	8·9	60	7·1
কুসুম	রেওয়া	25	8·2	—	—
	ইন্দোর	20	3·9	40	3·9
	ঝাঁসী	20	7·7	40	6·4
	রাঁচী	20	2·8	—	—
	আগ্রা	30	7·5	60	7·4

(Source : Chowdhury, S. L. Fertilizer News, 1979, 24(9) 61—66, 10[illegible]).

এর উদ্দেশ্য হ'ল, দেশের বিভিন্ন শুষ্ক এলাকার বৃষ্টি নির্ভর অঞ্চলে বিভিন্ন ফসলে সার ব্যবহারজনিত লাভ বা উপকার উদাহরণাদি দ্বারা ব্যাখ্যা করা। এর দ্বারা এসব এলাকার কৃষকরা সারব্যবহারে কতটা সুফল বা লাভ পাবে, সে সম্বন্ধে তাদের একটি সম্যক ধারণা জন্মাবে। এতে নিম্ন এবং উচ্চমাত্রায় নাইট্রোজেন সার ব্যবহার করে মূল্য ঃ খরচের অনুপাত (value ঃ Cost ratios) নির্ণয় করা হয়েছে। এতে শুষ্ক তথা খরাপ্রবণ এলাকায় সার ব্যবহারে কতটা লাভ, তার একটা সুন্দর চিত্তাকর্ষক সূচক পাওয়া গেছে। এই মূল্য ঃ খরচের অনুপাত বলতে বোঝায় যে, এক টাকার নাইট্রোজেন সার ব্যবহারে ৩ টাকার যোগ্য অতিরিক্ত ফলন পাওয়া গেছে। এতে সম্প্রসারণ কর্মী তথা কৃষকদের একটা অবস্থা নির্মাণে যথেষ্ট সহায়তা বৃদ্ধি করবে এবং বৃষ্টি নির্ভর অসেচ এলাকায় বৈজ্ঞানিকভাবে সুষম সার ব্যবহারের প্রবণতা বৃদ্ধি পাবে।

সারণী 13 তে সাধারণভাবে দেশের কোন্ কোন্ নিশ্চিত শুষ্ক এলাকায় কি মাত্রায় সার (নাইট্রোজেন ও ফসফেটঘটিত রাসায়নিক সার) ব্যবহার করা যাবে, তা দেওয়া হল।

সারণী 13 ঃ শুষ্ক এলাকায় সার ব্যবহারে নিশ্চিত এলাকাসমূহ (Assured areas for fertilizer use in drylands)

শস্য	সার ব্যবহারের মাত্রা, কেজি/হে.		এলাকা
	নাইট্রোজেন (N)	ফসফেট (P_2O_5)	
দানাশস্য ঃ			
(১) উচ্চ স্থানের ধান (Upland Rice)	60	30	ভুবনেশ্বর (মাঝারি ও নীচু জমি), রাঁচী (উঁচু ও নীচু জমি), বারাণসী, দেরাদুন।
(২) ভুট্টা	60	30	রাঁচী, সম্বা, দেরাদুন, লুধিয়ানা (হোসিয়ারপুর) বাঙ্গালোর, ইন্দোর।

শস্য	সার ব্যবহারের মাত্রা, কেজি/হে.		এলাকা
	নাইট্রোজেন (N)	ফসফেট (P_2O_5)	
(৩) বাজরা	40	30	ইন্দোর, সম্বা (উচ্চ জমি), আকোলা, কোভিলপাট্টি, শোলাপুর, হায়দ্রাবাদ, বিজাপুর, রেওয়া, উদয়পুর।
(৪) জোয়ার	30	20	শোলাপুর, বিজাপুর, আনন্দ, রাজকোট, আগ্রা, হিসার।
(৫) রাগী	40	30	বাঙ্গালোর, রাঁচী (উচ্চ জমি), ভুবনেশ্বর।
(৬) গম	60	30	সম্বা (জম্বু ও কাশ্মীর), দেরাদুন, রেওয়া।
তৈলবীজ শস্য ঃ			
(১) চীনাবাদাম	10	30	অনন্তপুর, রাঁচী, রাজকোট, ভুবনেশ্বর, রেওয়া।
(২) কুসুম	30	20	ঝাঁসী, ইন্দোর, শোলাপুর, আকোলা, আগ্রা, বিজাপুর, বারাণসী।
(৩) সরিষা	30	20	বারাণসী, লুধিয়ানা (হোসিয়ারপুর), আগ্রা, দেরাদুন, ঝাঁসী, সম্বা।
(৪) রেড়ি	50	20	হায়দ্রাবাদ, রাজকোট, আনন্দ।
ডালশস্য ঃ			
(১) ছোলা	0	30	দেরাদুন, বারাণসী, লুধিয়ানা (হোসিয়ারপুর), আগ্রা।
(২) অড়হর	10	30	রেওয়া, দেরাদুন, আগ্রা, শোলাপুর, ইন্দোর, হায়দ্রাবাদ, আকোলা, রাঁচী।

চিত্র 12-এ ভারতবর্ষের মানচিত্রে বিভিন্ন স্থানে সর্বভারতীয় শুষ্ক চাষ প্রকল্প সমন্বিত গবেষণা প্রকল্পের সাহায্যকারী গবেষণা কেন্দ্রের স্থান এবং সমন্বয় বিভাগ ও গবেষণা কেন্দ্রগুলির অবস্থান দেখান হয়েছে।
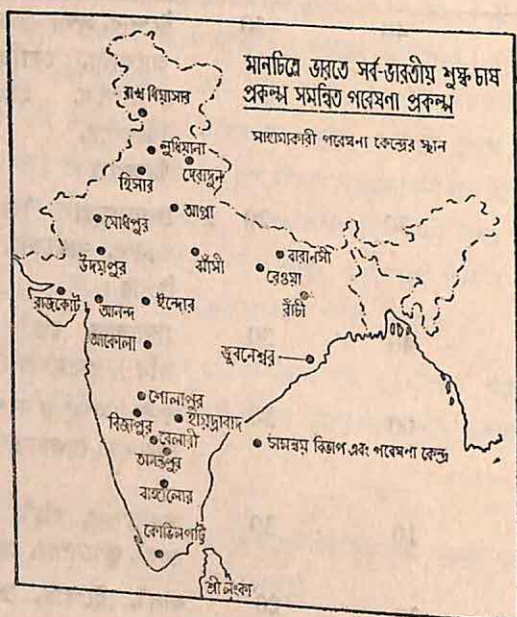
চিত্র 12 :

আগের বিভিন্ন গবেষণালব্ধ ফলাফলের পর্যালোচনা করে বৃষ্টি-নির্ভর এলাকায় সারের লাভজনক ও তাৎপর্যপূর্ণ বিক্রিয়া সম্বন্ধে আলোচনা করা হয়েছে। এর থেকে সেচ এলাকার সঙ্গে তুলনামূলকভাবে মাঝারি মাত্রায় সার ব্যবহার সম্বন্ধে বিভিন্ন শুষ্ক তথা খরা প্রবণ এলাকার জমির বিভিন্ন অবস্থানে সুপারিশ করা যায়।

উচ্চফলনের জন্য কিছু প্রস্তাব এবং কৃষি উপাদানের দক্ষব্যবহার (Suggestions for high yields & efficient use of inputs) :

একটি নির্দিষ্ট ব্যবহারিক সারমাত্রায় ফলনের বৃদ্ধি অনেক কারণের উপর নির্ভরশীল এবং এইসব কারণ মানুষের আয়ত্তাধীন। একটি সম্পূর্ণ উন্নত কৃষি পদ্ধতি অবশ্যই নিশ্চিতভাবে শস্যের উৎপাদন পদ্ধতি বৃদ্ধি করে। এতে

সর্বোচ্চ ফলন বৃদ্ধি পায় এবং সার সহ অন্যান্য কৃষি উপাদানগুলির দক্ষ ব্যবহারে নিশ্চিতভাবে সম্পন্ন হয়।

13 নং চিত্রে বাজরা বা জোয়ার চাষে একক বা সম্মিলিতভাবে বিভিন্ন কৃষি উপাদান অবলম্বনের প্রভাব দেখানো হয়েছে। দেখা গেছে, চিরাচরিৎ পদ্ধতিতে জোয়ারের দানা শস্যের ফলন 3·3 কুইণ্টাল / হেক্টর পাওয়া গেছে এবং উন্নত
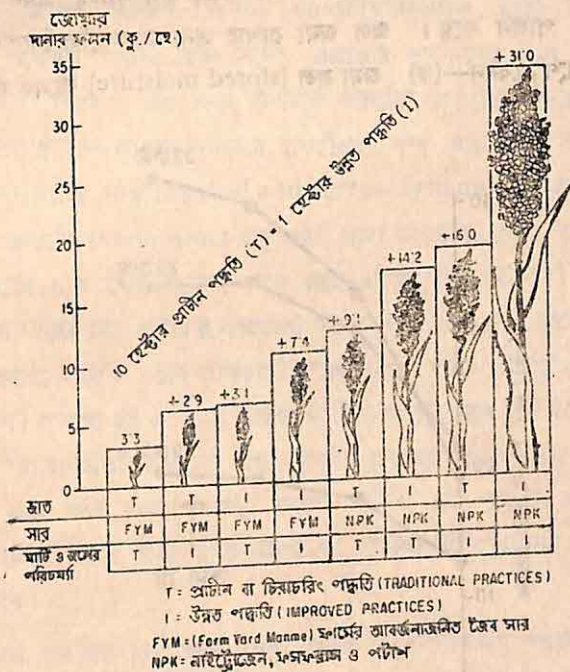
চিত্র 13 : বৃষ্টি নির্ভর জোয়ার চাষে পাশাপাশি প্রাচীন পদ্ধতি এবং উন্নত পদ্ধতিতে ফার্মের আবর্জনা জনিত জৈবসার ও রাসায়নিক সার (নাইট্রোজেন, ফসফরাস ও পটাশ) ব্যবহারে জাত/সার/মাটি ও জলের পরিচর্যার ভিত্তিতে প্রাপ্ত ফলন (কু./হে.)।

পদ্ধতির সম্মিলিত প্রয়োগে প্রায় 10 গুণেরও বেশী ফলন (34·3 কু/হে.) পাওয়া গেছে। কেবলমাত্র উন্নত জাত বা সার বা মাটি ও জলের পরিচর্যার একক ব্যবহারে এমনকি এক টন পর্যন্ত ফলন ও বৃদ্ধি করতে পারেনি। কিন্তু চিরাচরিৎ বা প্রাচীন পদ্ধতিতে এই তিনের সম্মিলিত প্রয়োগে 10 হেক্টর জমির ফলন = উন্নত পদ্ধতিতে 1 হেক্টর জমির ফলন পাওয়া যায়। এইভাবে কৃষি উপাদানগুলির সর্বোচ্চ ব্যবহারে উন্নীত করা সম্ভব হয়।

বৃষ্টি নির্ভর অবস্থায় সর্বোত্তম ফলন (optimum yields) এবং কৃষি উপাদানগুলির দক্ষ ব্যবহারের জন্য নিম্নবর্ণিত বিষয়ে বিশেষ নজর দেওয়া অবশ্যই কর্তব্য (এস. এল. চৌধুরী 1979)।

(1) **মাটির বৈশিষ্ট্য ঃ** বিভিন্ন মাটির জল ধরে রাখার ক্ষমতা বিভিন্ন ধরনের। ভারী বা কাদা মাটিতে বেশী পরিমাণ জল ধরে রাখা বা জমা করে রাখা সম্ভব। **মাটির গ্রথন ঃ** মাঠে জল ধরে রাখার জন্য মাটির গ্রথন একটি মুখ্য ভূমিকা পালন করে। জল জমা রাখার জন্য কতকগুলি নির্দেশাবলী খুবই গুরুত্বপূর্ণ, যেমন—(ক) জমা জল (stored moisture) অনেক ফসলের
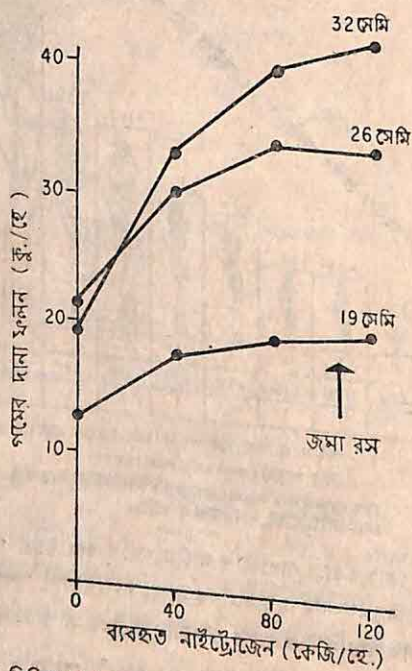
চিত্র 14 ঃ জমির বিভিন্ন জমারসে বিভিন্ন মাত্রায় নাইট্রোজেন সার ব্যবহারে প্রাপ্ত গমের ফলন।

পক্ষে একটি প্রধান উৎস, বিশেষ করে রবি বা বোরো মরসুমে। (খ) ব্যবহৃত সার এবং ফসলেরউপর এই জমা জল খুবই প্রভাব ফেলে। চিত্র 14-তে দেখা যায় যে মাঝারি গ্রথন যুক্ত মাটিতে ভালভাবে জমা রসে নাইট্রোজেন খাদ্য

উপাদানের উচ্চমাত্রা ব্যবহারে গমের ফলন সর্বোচ্চ পরিমাণ পাওয়া গেছে। এর ফলে একজন শুষ্ক এলাকার কৃষক মাটির এই প্রকৃতি ও জলের সম্পর্ক অনুধাবন করে নিজেই সিদ্ধান্ত নিতে পারবে যে সে বছরে একটি কি দুটি ফসল চাষ করবে।

(2) **জলের সংরক্ষণ** (Water conservation) ঃ মাটি এবং জলের বিভিন্ন সংরক্ষণ পদ্ধতি হ'ল শুষ্ক এলাকায় চাষবাসের মূল ও প্রাথমিক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। এর জন্য উপযুক্ত **মাল্চিং** বা মাটির উপরে রাখা ভেজা খড়, পাতা প্রভৃতির আবরণ ব্যবহারে বাষ্পীভবন বন্ধ করা যায় বা কম হয়। বিছানা ও নালি পদ্ধতিতে (bed and furrow systems) গাছ লাগিয়ে মাটির রসের তাড়াতাড়ি যোগান পাওয়া যায় এবং খাদ্য উপাদান গ্রহণে সাহায্য করে। রবিমরসুমে চাষ শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে লাঙ্গল দিলে মৌসুমী বৃষ্টিপাতের সময় জল গড়িয়ে চলে যাওয়ার সম্ভাবনা অনেক কমে যায় এবং এতে জল ধরে রাখার ক্ষমতা বাড়ে। তবে অধিকবার লাঙ্গল দেওয়া কখনোই উচিত নয়। এতে মাটি বেশী আলগা হয় এবং রস আলগা মাটিতে বাষ্পীভবনে নষ্ট হয়ে যায়। এর জন্য বর্ষাকালে অতিরিক্ত গড়িয়ে যাওয়া জলকে সবসময় মাঠের মধ্যে ছোট ছোট পুকুরে জমা করে রাখার ব্যবস্থা করতে হবে। এই জলের সাহায্যে খরা বা শুকনোর সময়ে শস্য চাষে **প্রাণদায়ী জলসেচ** (life-saving irrigation) সম্ভব হবে।

অনেক পরীক্ষা নিরীক্ষায় দেখা গেছে যে, আগের জমা জলের একটি মাত্র 5 সে. মি. সেচ ব্যবহারে শুষ্ক অবস্থার মধ্যেও শস্যের ফলন আশাতীতভাবে বৃদ্ধি পায়।

তাই অতিরিক্ত গড়িয়ে যাওয়া জল আগামী শুষ্ক দিনের জন্য জমা করে (water harvesting) রেখে খরার সাথে ভালভাবে যুদ্ধ করা যায় এবং কৃষি উপাদানগুলির দক্ষ ব্যবস্থার নিশ্চিত করা ও কৃষকদের চেষ্টা সফল করা সম্ভব হয়।

(3) **উপযুক্ত শস্য ও জাতের ব্যবহার** (Use of suitable crops and varieties) ঃ

যেখানে চিরাচরিৎ ফসল কম এবং উপযুক্ত ও উন্নততর বিকল্প ব্যবস্থা বর্তমান, সেখানে ঐ এলাকার সর্বোত্তম উপযুক্ত শস্য ও তার উন্নত জাত অবশ্যই

ব্যবহার করা উচিত। শুষ্ক এলাকার জন্য নির্দিষ্ট উপযুক্ত স্বল্পমেয়াদী উচ্চ ফলনশীল জাত বাছাই করে তা চাষ করতে হবে। এইসব উন্নত জাত যাতে সীমিত রসের যোগানে ভালভাবে বৃদ্ধি পেয়ে পুষ্ট হতে পারে এবং ব্যবহৃত সারের উপকার নিতে পারে সেদিকে নজর দিতে হবে। স্বল্পমেয়াদী জাতের ব্যবহারে জমিকে আগে খালি করে দো-ফসলী করার পরিকল্পনা নেওয়া সম্ভব হবে।

(4) **জলদি বপন** (Early sowings) ঃ গবেষণা করে দেখা গেছে যে, স্বাভাবিক বপনের আগে বীজ বুনলে 25—50% ফলন বৃদ্ধি পায়। সুতরাং তাড়াতাড়ি বীজ বুনে অধিক ফসল উৎপাদন সম্ভব। বাজরা জাতীয় ফসলকে নির্দিষ্ট সময়ে রোগ-পোকার আক্রমণ থেকে বাঁচানো যায়। তাড়াতাড়ি বীজ বুনতে হলে আগের ফসল কাটার সঙ্গে সঙ্গে বা সম্ভব হলে তার একটু আগে বীজতলা প্রস্তুত করার কাজ এগিয়ে রাখতে হবে। বীজবোনা মৌসুমী বৃষ্টিপাতের আগেই শেষ করতে হবে। দাক্ষিণাত্যের রবি এলাকায় বাজরা বোনার কাজ চিরাচরিৎ অক্টোবর মাসের বদলে সেপ্টেম্বরে এগিয়ে আনতে হবে।

(5) **গাছের উত্তম স্থাপন** (Good stand) **এবং আগাছা দমন** ঃ একমাত্র সর্বোত্তম গাছের সংখ্যা মাটি থেকে ভালভাবে জল ও সারের ব্যবহার করতে সক্ষম
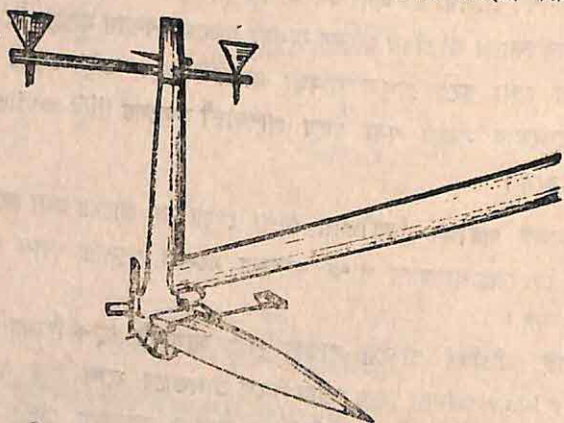
চিত্র 15 ঃ দেশী লাঙ্গলের সঙ্গে বীজবোনা ও সার দেওয়ার সহজ ব্যবস্থায় শুষ্ক এলাকার কৃষকরা স্বল্প খরচে একই সময়ে দুটি কাজ দক্ষভাবে করতে পারেন।

হয় এবং ফলন আশানুরূপ বৃদ্ধি পায়। তাই ছড়িয়ে বীজ বোনার থেকে বীজ-বপন যন্ত্রের (seed-drill) সাহায্যে সারিতে বীজ বোনা সব থেকে ভাল কার্যকরী। সারিতে বীজ বুনলে আগাছা দমন, রোগ-পোকার ঔষধ দেওয়া

প্রভৃতি অন্যান্য মাধ্যমিক পরিচর্যার সুবিধা হয়। দেশী লাঙ্গলের সঙ্গে এবং বীজ বোনার ড্রিল অতি সহজেই দুটি চোঙের সঙ্গে দুটি নল জুড়ে দিয়ে (চিত্র
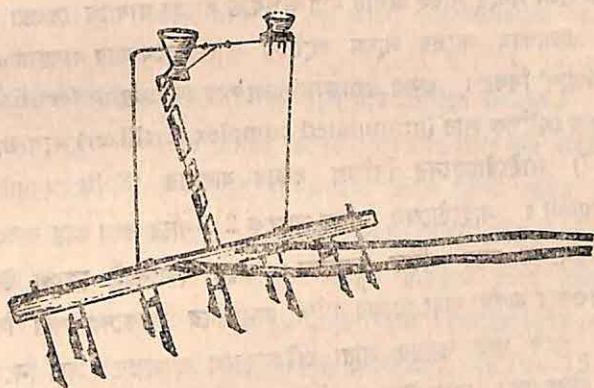
চিত্র 16 : একটি পরীক্ষাক্ষেত্রেএরূপ বীজ ও সার বপন যন্ত্র ব্যবহার করে রাগী ফসলে 15-25% বেশী ফলন পাওয়া গেছে।

15, 16, 17) একই সময়ে স্বল্প খরচে শুষ্ক এলাকার কৃষকরা দুটি কাজ দক্ষতার সঙ্গে সম্পন্ন করতে পারে। এতে ফালের সাহায্যে নালি তৈরী হওয়ার পর সার ফেলা ও বীজ বোনার কাজ একসঙ্গে হয়ে যায় এবং মাটিও সঙ্গে সঙ্গে চাপা পড়ে যায়। শুষ্ক এলাকায় আগাছা জল, সার, আলো, স্থান প্রভৃতি উপাদানে ভাগ বসিয়ে ফলন কমিয়ে দিতে পারে। তাই অঙ্কুরেই আগাছা দমন কর্তব্য। এর জন্য আগে থেকে আগাছা মুক্ত বীজ বাছাই করে, জমির আগাছা নষ্ট করে চাষবাস করতে হবে, অথবা চাষের পর হাত দিয়ে, নিড়ানির সাহায্যে বা আধুনিক উপযুক্ত আগাছা নাশক ঔষধ শস্যের প্রাথমিক অবস্থায় ব্যবহার করে এদের দমন করতে হয়।

(6) **সুষম সার ব্যবহার** (Application of balanced fertilizer) : মাটির পরীক্ষার ভিত্তিতে যে কোন মাটিতেই বিভিন্ন শস্যের চাহিদা অনুযায়ী সুষম সার ব্যবহার করা অবশ্যই বাঞ্ছনীয়। সেচ ও অসেচ বা বৃষ্টি নির্ভর শুষ্ক এলাকায় একক উৎপাদনে খাদ্য উপাদানের প্রয়োজনীয়তার খুব একটা পার্থক্য নেই। **13নং সারণীতে** শুষ্ক এলাকায় বিভিন্ন ফসলের নাইট্রোজেন ও ফসফেট খাদ্য উপাদানের ব্যবহারিক মাত্রা দেওয়া হয়েছে। 14 নং চিত্রে একটা নির্দিষ্ট এলাকায় বিভিন্ন মাত্রায় সার ব্যবহারে শস্যের ফলন বৃদ্ধি দেখানো

হয়েছে। খরিফ মরসুমে সাধারণভাবে সমূহ ফসফেট (P_2O_5) + পটাশ (K_2O) + প্রায় 50% নাইট্রোজেন ঘটিত সার মূল সার হিসাবে দেওয়া বাঞ্ছনীয়। রবিমরসুমে সমূহ সারই একটি মাত্র উপযুক্ত সারের মাধ্যমে দেওয়া খুব ভাল। শুষ্ক এলাকায় গাছের সুষম পুষ্টির জন্য সুষম সার ব্যবহার একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। এসব এলাকায় সরল সার (straight fertilizer) অপেক্ষা দানাদার যৌগিক সার (granulated complex fertilizer) খুব ভাল।

(7) **নাইট্রোজেনের বিভিন্ন দফায় ব্যবহার** (Split application of nitrogen) : নাইট্রোজেন ঘটিত সারকে 2-3 বারে ভাগ করে ব্যবহার করা খুব ভাল, বিশেষ করে খরিফ মরসুমে। এতে ফলনেরই কেবল উন্নতি হয় না, আবহাওয়ার অবস্থা এবং গাছের বৃদ্ধি অনুসারে কৃষকদের সার দিতে সাহায্য করে। এতে গাছ তাদের সারা জীবনকালে ভালভাবে সার নিতে পারে এবং পুষ্টি ভাল হয়। ফলে উৎপাদন বৃদ্ধি পায়।

সারণী 14-তে নাইট্রোজেনের বিভিন্ন দফায় ব্যবহার বনাম একবারে ব্যবহারের সুবিধা বিষয়ে ই. ডি. স্প্রাট ও এস. এল. চৌধুরীর (1978) এক গবেষণার ফলাফল দেওয়া হ'ল।

সারণী 14 : বৃষ্টি-নির্ভর শস্যে নাইট্রোজেনের বিভিন্ন দফায় ব্যবহার বিষয়ে কিছু ফলাফল (কু./হে.)

শস্য	গবেষণাকেন্দ্রের স্থান	সারব্যবহার পদ্ধতি	ফলন	ফলন বৃদ্ধি (%)
ফিঙ্গারমিলেট বা রাগী	বাঙ্গালোর	সমূহ লাগানোর সময়	25·1	—
		3টি দফায়	27·8	2·7
ভুট্টা	দেরাদুন	সমূহ লাগানোর সময়	34·7	—
		3টি দফায়	38·1	3·4
উঁচু এলাকার ধান	রাঁচী	সমূহ লাগাবার সময়	24·8	—
		2টি দফায়	33·9	9·1
ঐ	রেওয়া	সমূহ লাগাবার সময়	27·0	—
		3টি দফায়	41·0	14·0
জোয়ার	উদয়পুর	সমূহ লাগাবার সময়	9·3	—
		2টি দফায়	13·0	3·7
বাজরা	আগ্রা	সমূহ লাগাবার সময়	8·5	—
		3টি দফায়	13·8	5·3

দ্রষ্টব্য : (1) সুপারিশমাত্রা (সাধারণত 40 কেজি নাইট্রোজেন/হে·) (2) 3টি দফা বলতে সাধারণতঃ বোঝায় $\frac{1}{4}$ অংশ বোনার সময়, $\frac{1}{2}$ পাঁশকাঠি ছাড়ার সময় এবং $\frac{1}{4}$ অংশ ফুল আসার ঠিক আগে (primordial stage) বা থোড় আসার আগে (boot stage)।

(8) নির্দিষ্ট গভীরতায় NP/NPK মূল সার হিসাবে ব্যবহার :

সাধারণতঃ শুষ্ক এলাকায় মাটির রসের কাছাকাছি মূল সার ব্যবহার করা উচিত। এতে গাছের শিকড় সহজেই উদ্ভিদ খাদ্য গ্রহণে সমর্থ হবে। ছড়িয়ে সার ব্যবহার খুবই অবৈজ্ঞানিক, কখনোই এভাবে দেওয়া উচিত নয়। এতে নানাভাবে বহু মূল্য সারের অপচয় ঘটে। খরিফ মরসুমে 50% নাইট্রোজেন সমূহ ফসফেট ও পটাশ এবং রবি মরসুমে সমূহ NPK (যেখানে চাপান হিসাবে নাইট্রোজেন ঘটিত সার অনাবৃষ্টির জন্য ব্যবহার সম্ভব নয়) সার 10—15 সে·মি· গভীরতায় শিকড়ের কাছাকাছি ব্যবহার করা উচিত। চিত্র 15, 16 ও 17-তে দেশী লাঙ্গল এবং ICRISAT এর বলদ টানা লাঙ্গলে এক সঙ্গে বীজবোনা ও সার দেওয়ার (seed-cum-fertilizer drill) সহজ ব্যবস্থা দেখানো হয়েছে। এতে খরচও বেশী নয়। নির্দিষ্ট গভীরতা অনুযায়ী বীজবোনা ও সার দেওয়ার কাজ এক সাথে করা যাবে।

15 নং সারণীতে অন্ধ্রপ্রদেশে এবিষয়ে এক পরীক্ষার ফলাফল দেওয়া হ'ল (ভেংকটেশ্বরলু, 1979)।

সারণী 15 : শুষ্ক অবস্থায় বিভিন্ন সার ব্যবহার পদ্ধতির উপকারিতা

বিষয়	বাজরা (অন্ধ্রের 5টি জায়গায় গড় ফলন
● সার ছড়িয়ে ব্যবহার করে প্রাপ্ত দানা শস্যের ফলন	2570 কেজি/হে·
● মাটির গভীরে সার প্রয়োগে	3700 কেজি/হে·
● গভীরে সার ব্যবহার করে উৎপাদন বৃদ্ধি	1130 কেজি/হে·
● গভীরে সার ব্যবহারে দক্ষতার বৃদ্ধি	9·1 কেজি/কেজি অতিরিক্ত খাদ্য উপাদান
● অতিরিক্ত ফলনের মূল্য-গভীরে সার ব্যবহারের জন্য	টাকা 1130/হে·
● সার মাত্রার মোট দাম (80—40—0)	টাকা 488/হে·

দ্রষ্টব্য : বাজরার মূল্য : 100 টাকা/100 কেজি
নাইট্রোজেনের মূল্য : 3·90 টাকা/কেজি
ফসফেটের মূল্য : 4·40 টাকা/কেজি। } 1979 সালের বাজার দাম অনুযায়ী।

গমের ক্ষেত্রে ছিটিয়ে বোনার থেকে মাটির গভীরে সার ব্যবহার করে (drilled fertilizer) 450 কেজি দানা/হে. অতিরিক্ত সুবিধা পাওয়া গেছে। যার মূল্য 527 টা./হে. (117 টাকা/কুইণ্টাল হিসাবে)। সার ব্যবহার মাত্রা ছিল 60—30—30 কেজি $N—P_2O_5—K_2O$/হেক্টার।

(9) **সার এবং জল ব্যবহারের দক্ষতা** (Fertilizer and water use efficiency) ঃ কিছু ফসলের নির্দিষ্ট বৃদ্ধি অবস্থায় সার ব্যবহারের পর বেশী পরিমাণে জলের প্রয়োজন হয়। 18 নং ছবিতে বৃষ্টি নির্ভর গম চাষে জলের
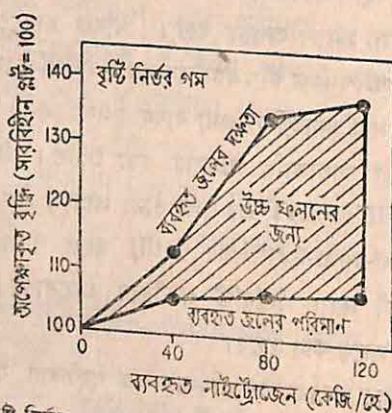
চিত্র 18 ঃ বৃষ্টি-নির্ভর গমচাষে জলের দক্ষতা বৃদ্ধিতে সার ব্যবহারের প্রভাব।

দক্ষতা বৃদ্ধিতে সার ব্যবহারের প্রভাব বিষয়ে রনজোধ সিং প্রভৃতির (1975) একটি গবেষণালব্ধ ফলাফল দেখান হয়েছে। এখানে সার ব্যবহারে জলের দক্ষতা 38% বৃদ্ধি পেয়েছে এবং অনিয়ন্ত্রিত জলের চাহিদা মাত্র 8% বৃদ্ধির প্রয়োজন।

(10) **সাথী ফসল ও মিশ্র চাষ** (Intercropping and mixed cropping) ঃ শুষ্ক এলাকায় অধিক উৎপাদন বৃদ্ধি এবং কৃষি উপাদানগুলির সর্বোত্তম ব্যবহারের জন্য সাথী ফসল ও মিশ্র চাষ খুবই লাভজনক। দানাশস্য ও মিলেট জাতীয় ফসলের সাথে শিম্বিগোত্রীয় ফসলের সাথী ফসল বা মিশ্র চাষের একটা বিশেষ গুরুত্ব রয়েছে। এতে দানা শস্য ও শিম্বিগোত্রীয় ফসল—উভয়েরই প্রভুত উপকার হয় এবং মাটিতে উর্বরতা বৃদ্ধি পায়। রাসায়নিক সার নাইট্রোজেন বন্ধনের জন্য কম দরকার হয়। স্বল্প নাইট্রোজেন সহ ফসফেট সার ব্যবহারে শিম্বি ফসলের উৎপাদন বৃদ্ধি করা দরকার।

চিত্র 17 : ICRISAT-এর উদ্ভাবিত এরূপ বীজ ও সার বপন যন্ত্র সহজেই বলদ দিয়ে পরিচালনা করা যায়।
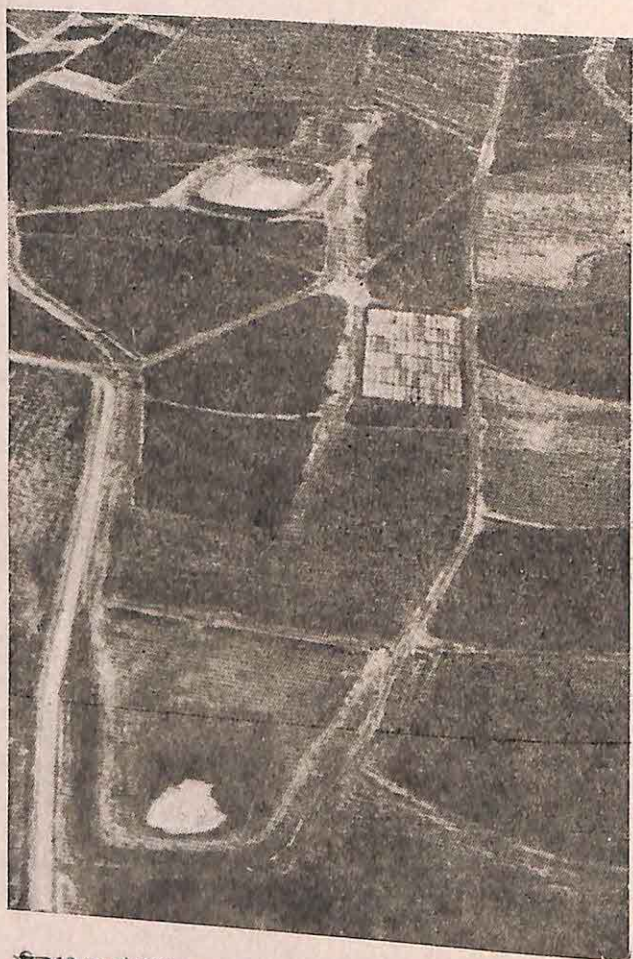
চিত্র 19 : ICRISAT-এর জমিতে ভূমিক্ষয়রোধ এবং জীবন-দায়ী সেচের জন্য বাঁধের নক্সা।

সুপারিশ ঃ বিভিন্ন শুষ্ক বা খরাপ্রবণ এলাকায় বিভিন্ন ফসল চাষে সার ব্যবহার কখনোই একই ধরনের হতে পারে না। তাই এলাকা-ভিত্তিক শুষ্ক চাষ পদ্ধতির ব্যাপক গবেষণা একান্তই প্রয়োজন। সেইভাবেই ভারতের বিভিন্ন শুষ্ক এলাকায় গবেষণা চলছে। স্থানীয় কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, অন্যান্য সংস্থার গবেষণা বিভাগের গবেষণালব্ধ ফলাফলের সঙ্গে একটা সমন্বয় প্রয়োজন। এই সমন্বিত গবেষণার ফলাফল সহজভাবে যাতে কৃষকদের জমিতে সম্প্রসারিত হয় সেজন্য সমস্ত সম্প্রসারণ কর্মীদের আন্তরিক প্রচেষ্টায় স্থানীয় কৃষক এবং শুষ্ক চাষ বিশেষজ্ঞদের সঙ্গে নিবিড় যোগাযোগ রাখতে হবে। এইসব নতুন তথ্য কৃষকদের বোঝাবার জন্য কৃষক দিবস, কৃষি মেলা, বিভিন্ন বৈজ্ঞানিক আলোচনাচক্র, কৃষকদের জমিতে সরাসরি বিভিন্ন পরীক্ষা তথা প্রদর্শনক্ষেত্র স্থাপন প্রভৃতি নিয়মিত ব্যবধানে কার্যকরী করতে হবে। এর জন্য সম্প্রসারণ কর্মী তথা কৃষি গবেষক এবং বৈজ্ঞানিকদের স্থানীয় কৃষকদের অভিজ্ঞতা, স্থানীয় ফসলের চাহিদা ও চাষবাস তথা সাংস্কৃতিক আচার ব্যবস্থা সম্বন্ধে বিশেষভাবে ওয়াকিবহাল হতে হবে এবং এসব বিষয়ে সমীক্ষা চালাতে হবে। গ্রামের মধ্যে বিভিন্ন গবেষণামূলক কাজে কৃষকদের সরাসরি অন্তর্ভুক্তি করলে, এতে অধিকাংশ নিরক্ষর কৃষকদের মধ্যে একটা মানসিক প্রেরণা ও উৎসাহ বৃদ্ধি পাবে এবং সমস্ত সংস্থাকে একযোগে যৌথভাবে কৃষির বিভিন্ন দিক নিয়ে কাজ করলে একটি সামগ্রিক উন্নতি সম্ভব হবে। এইসব সমস্যাবহুল এলাকায় মোটামুটি সমস্ত সংস্থার সম্প্রসারণ কর্মীদের যৌথ প্রচেষ্টায় খুব স্বল্প সময়েই উন্নতি সাধন সম্ভব।

ষষ্ঠ অধ্যায়

ভারতবর্ষের বিভিন্ন শুষ্ক এলাকায় বিভিন্ন প্রকার ফসল চাষে প্রাপ্ত গবেষণার গড় ফলাফল

(Achievement levels of crops in various agro-climatic zones at each research centre in India)

নীচের সারণী 16-তে ভারতের বিভিন্ন কৃষি আবহাওয়াযুক্ত শুষ্ক এলাকার বিভিন্ন প্রকার মাটি, ফসল চাষের সময়কাল, গবেষণালব্ধ ফলাফল, কৃষকদের চিরাচরিৎ চাষের ফলন, অন্যান্য ফসল চাষ প্রভৃতি সম্বন্ধে পর্যালোচনা করা হ'ল।

শুষ্ক এলাকার কৃষকদের কাছে গবেষণালব্ধ ফলাফলের ভিত্তিতে কিছু প্রস্তাবনা ঃ

আগেই বলা হয়েছে, এইসব শুষ্ক এলাকায় যেহেতু **জলই একমাত্র সীমিত কারণ,** তাই **মাটির রস সংরক্ষণ করে বিভিন্ন স্বল্পমেয়াদী খরাসহনশীল উচ্চফলনশীল জাতের ফসল নির্বাচন করতে হবে** এবং বর্ষাকালের **অতিরিক্ত গড়িয়ে যাওয়া জলকে মাঠের মধ্যে ছোট ছোট পুকুর, নালা প্রভৃতিতে জমা করে রাখার ব্যবস্থা করতে হবে।**

এছাড়া **গভীর শিকড়যুক্ত খরা-সহনশীল শস্য** (deep rooted crops), যেমন—রেড়ি, অড়হর এবং তুলা প্রভৃতি ফসলের চাষ করতে হবে। এতে মাটির গভীর থেকে জল সংগ্রহ ছাড়া ও **মাটির গ্রথন** উন্নত হয় এবং **মাটিতে জৈব পদার্থ শিকড়ের পচনের সঙ্গে সঙ্গে যুক্ত হবে।**

অতিরিক্ত গড়িয়ে যাওয়া জলের সংরক্ষণের জন্য **বিভিন্ন কাঠামোর** এখন উন্নতিসাধন সম্ভব হয়েছে। এতে ক্ষুদ্র তথা বড় বড় চাষীদের খামারের জন্য সবরকম কাঠামো নির্মাণ সম্ভব হয়েছে। চিত্র 19 এ ICRISAT, হায়দ্রাবাদের মাঠগুলির বিভিন্ন প্রকার উঁচু-নীচু অবস্থানকে বাঁধ দিয়ে ভূমিক্ষয় ঠেকানোর ব্যবস্থা কাঠামো নেওয়া হয়েছে। মাঠের মাঝে অতিরিক্ত জলের সঞ্চয় করে পরবর্তী সময়ের জন্য এবং **জীবন প্রদায়ী** সেচের ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে।

কৃষি-আবহাওয়াযুক্ত এলাকা (Agro-climatic zone) এবং গবেষণা কেন্দ্র	প্রতিনিধি স্থানীয় ফসল এবং এলাকা (%)	সময়কাল	গবেষণা-লব্ধ ফলন (কু./হে.)	কৃষকদের ফলন (কু./হে.)	এইসব এলাকার অন্যান্য ফসল
1	2	3	4	5	6
1. সম-পাহাড়ী এলাকা :	**এ্যালুভিয়াল মাটি**				
(ক) লুধিয়ানা :	ভুট্টা (80)	জুন-সেপ্টেম্বর	35	20	মথবীন, ধান, বাজরা (পশু খাদ্য), মুসুর, আখ, জোয়ার, অড়হর, চীনাবাদাম, কলাই, ছোলা, যব, তিসি, মটর তিল, আলু, রাই প্রভৃতি।
	গম (70)	নভেম্বর-ফেব্রুরারী	45	10	
	ছোলা (15)	অক্টোবর-ফেব্রুয়ারী	15	8	
	সরিষা (5)	ঐ	20	5	
(খ) সম্বা :	ভুট্টা (25)	জুন-সেপ্টেম্বর	50	10	
	গম (75)	নভেম্বর-ফেব্রুয়ারী	50	15	,,
(গ) দেরাদুন :	ভুট্টা (75)	জুলাই-সেপ্টেম্বর	50	10	,,
	সয়াবীন (71)	ঐ	30	—	,,
	গম (15)	নভেম্বর-ফেব্রুয়ারী	30	10	,,
2. সম-আর্দ্র-এলাকা :	**এ্যালুভিয়াল মাটি**				
(ক) বারাণসী :	উঁচু স্থানের ধান (35) (upland rice)	জুলাই-অক্টোবর	40	7	সিটারিয়া, কলাই, তিল, তিসি, মটরশুঁটি, সরিষা, সূর্যমুখী প্রভৃতি।
	ভুট্টা (9)	ঐ	35	1	
	গম (18)	নভেম্বর-ফেব্রুয়ারী	25	10	,,
	ছোলা (18)	অক্টোবর-ফেব্রুয়ারী	35	8	,,

কৃষি-আবহাওয়াযুক্ত এলাকা (Agro-climatic zone) এবং গবেষণা কেন্দ্র	প্রতিনিধি স্থানীয় ফসল এবং এলাকা (%)	সময়কাল	গবেষণা-লব্ধ ফলন (কু./হে.)	কৃষকদের ফলন (কু./হে.)	এইসব এলাকার অন্যান্য ফসল
1	2	3	4	5	6
(খ) আগ্রা :	বাজরা (43)	জুলাই-সেপ্টেম্বর	20	7	,,
	অড়হর (45)	জুলাই-অক্টোবর	12	10	,,
	যব বা বার্লি (11)	অক্টোবর-ফেব্রুয়ারী	22	14	,,
	ছোলা (11)	ঐ	17	8	,,
3. শুষ্ক এলাকা (Arid) : সিরোজেম মাটি (Sierozem soil)					
(ক) যোধপুর :	বাজরা (51)	জুলাই-সেপ্টেম্বর	30	2	অড়হর, সিটোরিয়া,
	কলাই (18)	ঐ	10	1	সূর্যমুখী, ধান, কলাই,
(খ) হিসার :	বাজরা (78)	ঐ	15	5	ঘোড়ামুগ, তিল, তুলা, লংকা,
	গুয়ার (18)	ঐ	10	3	মেস্তা প্রভৃতি।
	রেপসরিষা (20)	অক্টোবর-ফেব্রুয়ারী	10	5	,,
(গ) আনন্দ :	বাজরা (17)	জুলাই-সেপ্টেম্বর	25	10	,,
	তুলা (20)	জুলাই-ফেব্রুয়ারী	10	3	,,
4. অর্দ্ধ-শুষ্ক : লালমাটি (গ্রানাইট)					
(ক) হায়দ্রাবাদ :	রেড়ি (55)	জুন-ফেব্রুয়ারী	20	7	অড়হর, বার্লি বা যব, ছোলা,
	জোয়ার (35)	জুলাই-অক্টোবর	40	3	চীনাবাদাম, আলু, সয়াবীন,

কৃষি-আবহাওয়াযুক্ত এলাকা (Agro-climatic zone) এবং গবেষণা কেন্দ্র	প্রতিনিধি স্থানীয় ফসল এবং এলাকা (%)	সময়কাল	গবেষণা-লব্ধ ফলন (কু./হে.)	কৃষকদের ফলন (কু./হে.)	এইসব এলাকার অন্যান্য ফসল
1	2	3	4	5	6
(খ) বাঙ্গালোর ঃ	ফিঙ্গার মিলেট বা রাগী (40)	আগষ্ট-অক্টোবর	35	10	রেপসরিষা, সরগুঁজা,
	ভুট্টা (3)	জুলাই-অক্টোবর	45	34	ঘোড়ামুগ, মেস্তা, সূর্যমুখী,
(গ) অনন্তপুর ঃ	চীনাবাদাম (27)	জুলাই-নভেম্বর	15	5	তিল, কুসুম প্রভৃতি।
	বাজরা (6)	জুলাই-অক্টোবর	10	3	”
5. অর্ধ-সম-আর্দ্র ঃ	লাল মাটি (গ্রানাইট)				
(ক) রাঁচী ঃ	উঁচু এলাকার ধান (52)	জুলাই-অক্টোবর	40	8	তিল, তিসি, বার্লি, ছোলা,
	ভুট্টা (7)	ঐ	40	11	চীনাবাদাম, আলু, সয়াবীন,
	রাগী বা ফিঙ্গার মিলেট (7)	ঐ	20	2	রেপসরিষা, সরগুঁজা, ঘোড়া-
	ছোলা (2)	অক্টোবর-ফেব্রুয়ারী	8	4	মুগ, মেস্তা, কুসুম, সূর্যমুখী
	তিসি (1)	ঐ	10	1	প্রভৃতি।
(খ) ভুবনেশ্বর ঃ	উঁচু এলাকার ধান (14)	জুলাই-অক্টোবর	35	5	”
	রাগী (3)	ঐ	25	8	”
	কালো মুগ (11)	অক্টোবর-ফেব্রুয়ারী	15	5	”
(গ) ঝাঁসী ঃ	জোয়ার (70)	জুলাই-অক্টোবর	17	9	”
	গম (60)	নভেম্বর-ফেব্রুয়ারী	11	11	”

কৃষি-আবহাওয়াযুক্ত এলাকা (Agro-climatic zone) এবং গবেষণা কেন্দ্র	প্রতিনিধি স্থানীয় ফসল এবং এলাকা (%)	সময়কাল	গবেষণা-লব্ধ ফলন (কু./হে.)	কৃষকদের ফলন (কু./হে.)	এইসব এলাকার অন্যান্য ফসল
1	2	3	4	5	6
6. অৰ্দ্ধ-শুষ্ক : কালোমাটি (ব্যাসাল্টিক) :					
(ক) আকোলা :	জোয়ার (32)	জুলাই-অক্টোবর	25	5	অড়হর, রেড়ি, ছোলা, কুসুম, তিসি, গম, কালোমুগ, সোনামুগ, বরবটি, সয়াবীন, তিল, গুয়ার, বার্লি, সূর্যমুখী, সিটেরিয়া, ধনে প্রভৃতি।
	তুলা (38)	জুলাই-জানুয়ারী	10	1	
(খ) রাজকোট :	চীনাবাদাম (33)	জুলাই-অক্টোবর	15	6	
	বাজরা (16)	ঐ	20	7	
	তুলা (14)	জুলাই-জানুয়ারী	6	1	
	জোয়ার (10)	জুলাই-অক্টোবর	20	2	
(গ) উদয়পুর :	ভুট্টা (43)	ঐ	30	9	„
(ঘ) কোভিলপট্টি :	বাজরা (20)	নভেম্বর-জানুয়ারী	25	7	„
	জোয়ার (3)	ঐ	20	2	„
7. অৰ্দ্ধ-শুষ্ক : কালোমাটি (ব্যাসাল্টিক)					
(ক) বেলারি :	জোয়ার (50)	সেপ্টেম্বর-ডিসেম্বর	10	2	কালোমুগ, সোনামুগ, ঘোড়ামুগ, গম, রেড়ি, ধনে, সিটেরিয়া, তিল, তিসি, সয়াবীন, সূর্যমুখী প্রভৃতি।
	তুলা (40)	সেপ্টেম্বর-ফেব্রুয়ারী	3	1	
(খ) বিজাপুর :	বাজরা (16)	জুলাই-সেপ্টেম্বর	15	15	
	চীনাবাদাম (9)	ঐ	10	3	

1	2	3	4	5	6
(গ) সোলাপুর :	জোয়ার (36)	সেপ্টেম্বর-ডিসেম্বর	25	5	,,
	কুসুম (3)	সেপ্টেম্বর-জানুয়ারী	20	—	,,
	বাজরা (8)	জুলাই-সেপ্টেম্বর	30	2	,,
	অড়হর (5)	জুলাই-ডিসেম্বর	20	3	,,
	জোয়ার (62)	সেপ্টেম্বর-ডিসেম্বর	30	3	,,
	ছোলা (2)	অক্টোবর-ফেব্রুয়ারী	13	3	,,
৪. সম-আর্দ্র : কালোমাটি	জোয়ার (9)	জুন-সেপ্টেম্বর	40	6	চীনাবাদাম, তুলা, সয়াবীন, তিল, তিসি, অড়হর, সোনা-মুগ, কালোমুগ, সূর্যমুখী, যব, রেপসরিষা, কোদো, ফিঙ্গার মিলেট, বরবটি, মুসুর প্রভৃতি।
(ক) ইন্দোর :	ভুট্টা (3)	ঐ	40	11	
	গম (17)	অক্টোবর-ফেব্রুয়ারী	11	4	
	ছোলা (8)	ঐ	13	5	
(খ) রেওয়া :	উঁচু এলাকার ধান (45)	জুলাই-সেপ্টেম্বর	50	5	
	জোয়ার (8)	ঐ	30	10	
	ভুট্টা (4)	ঐ	35	10	
	গম (52)	নভেম্বর-মার্চ	18	7	
	ছোলা (21)	অক্টোবর ফেব্রুয়ারী	13	7	
	তিল (15)	ঐ	6	2	

দ্রষ্টব্য : ( ) গবেষণালব্ধ ফসল সর্বোত্তম উৎপাদনের গড় ফলন ; (2) % এবং গড় কৃষক ফলন প্রত্যেক সেন্টারের মুখ্য বৈজ্ঞানিক কৃষিবিদ কর্তৃক হিসাব অনুযায়ী পাওয়া তথ্য ; (3) আনন্দ যদিও অর্ধ-শুষ্ক, এখানে শুষ্ক এলাকা হিসাবেই আলোচিত। এখানকার বালি মাটি প্রায়ই ধরাগ্রস্ত ; (4) কোভিলপট্টিতে ভিন্ন প্রকার বর্ষা মরশুম (অক্টোবর—জানুয়ারী)।

(Source : Dryland Agriculture Research Progress Report 1970-75, ICAR, 1977, PP. 27)।

চিত্র 20 তে উঁচু-নীচু জমির অবস্থানে সমঢালে "কণ্টুর বাঁধ" (Contour bund), গ্রেডেড্ বাঁধ (Graded bund) এবং গোড়া চওড়া টেরাস (Broad
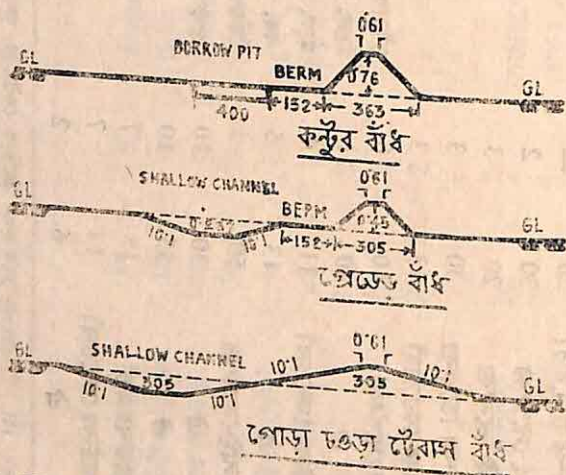
চিত্র 20 : অসমতল জমিতে কণ্টুর বাঁধ, গ্রেডেড বাঁধ এবং গোড়া চওড়া টেরাস বাঁধ নির্মাণ।

Base Terrace) নির্মাণ করে জমিকে চাষযোগ্য করার ছক দেখানো হয়েছে। এর ফলে ভূমিক্ষয় ও জলক্ষয় রোধ করে, ছোট ছোট সমতল জমিতে উন্নত চাষ করা সম্ভব হবে।

21 নং চিত্রে একটি একই ভার্টিজল জলাধারে তিনটি বিকল্প মাটি ও জলের সংরক্ষণ এবং ব্যবস্থা পদ্ধতি ব্যাখ্যা করে দেখানো হয়েছে। 0·6% ঢালে মাঠের বাঁধের মধ্যে চওড়া বাঁধ এবং নালা পদ্ধতি 5 বছর আগে (150 সে. মি.) তৈরী করা হয়েছিল (Layout b) এবং তার পরেও তা মোটামুটি কার্যকরী অবস্থায় আছে। Layout c তে একই স্থায়ী চওড়া বাঁধ ও নালা পদ্ধতি মাঠ বাউন্ডারী সরিয়ে ফেলে একটি ঘাসের আচ্ছাদিত জলের রাস্তা (grassed waterway) এবং

একটি জলাধার (tank) দেখানো হয়েছে। Layout a তে সমঢাল বাঁধ বা 'কণ্টুর বাঁধ' খুব কমই চাষীরা করে থাকেন। কারণ তারা তাদের ক্ষুদ্র ক্ষেতকে
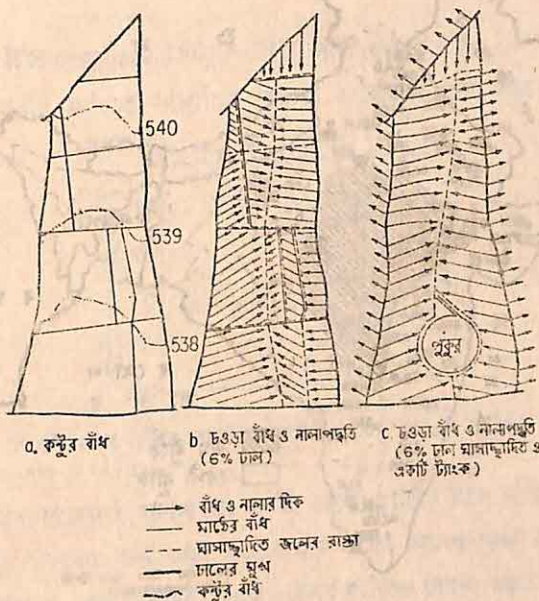
চিত্র 21 : তিনটি বিভিন্ন মাটিতে বিভিন্ন বাঁধ নির্মাণ পদ্ধতির সাহায্যে একটি ভার্টিজল জলাধার প্রস্তুতি দেখানো হয়েছে।

আর খণ্ডিত করতে চান না। সুতরাং মাঠ বাউণ্ডারীতেই তারা কণ্টুর বাঁধ নির্মাণ করে থাকে। তবে এতে জল জমা ও বাঁধে ফোকর বা গর্ত হওয়ার সমস্যা দেখা দেয়।

22নং চিত্রে ভারতবর্ষের ম্যাপে **ভার্টিজলে** (কালোমাটি) শুকনো বীজ বপনের সম্ভাবনা দেখানো হয়েছে। এতে মোটামুটি কোন্ কোন্ এলাকায় **বেশী ঝুঁকি** এবং কোথায় **কম ঝুঁকি** তা দেখানো হয়েছে। এর ফলে দেশের বিভিন্ন অবস্থানে ও আবহাওয়ার পরিস্থিতিতে কখন কিরূপ ফসল চাষ

সম্ভব হবে, তার একটি মোটামুটি পরিকল্পনা করা সম্ভব হবে (এস্ এম· ভিরমানী, 1979)।
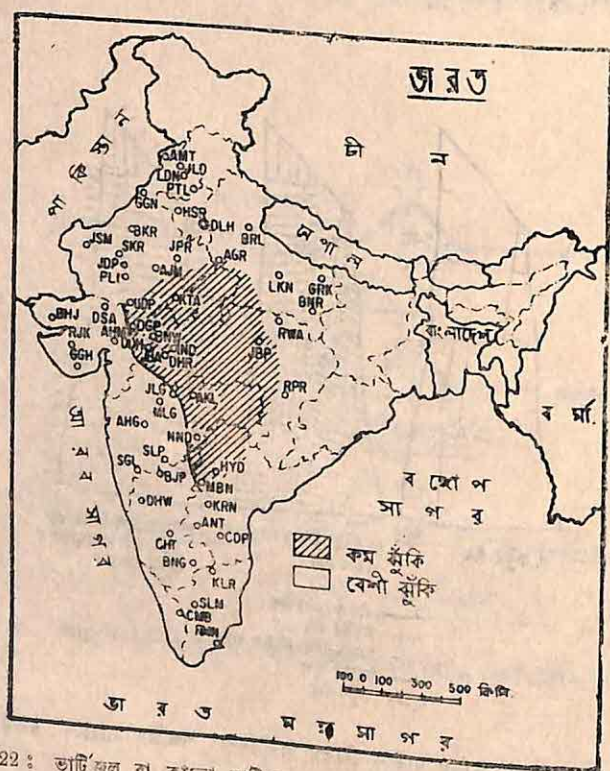
চিত্র 22 : ভার্টিজল বা কালো মাটিতে শুকনো বীজ বপনের ঝুঁকি (কম বা বেশী) কোথায় কতটা দেখান হয়েছে।
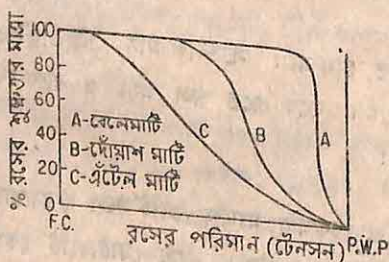
চিত্র 23 : তিনটি বিভিন্ন মাটিতে শুষ্কতার মাত্রা।

23 নং চিত্রে তিনটি মাটিতে (বেলে মাটি, দোঁয়াশ মাটি এবং এঁটেল মাটি) শুষ্কতার হার এবং জলীয় পদার্থের পরিমাণ দেখানো হয়েছে (হোম্স, 1961)।

এঁটেল মাটিতে ছিদ্রতার পরিমাণ কম হওয়ায় জল অনেকদিন ধরে রাখা যায় এবং শুষ্কতার হার সব থেকে কম (C—Clayey soil)। একইভাবে B—Loamy soil (দোঁয়াশমাটি) এবং A—Sandy soil (বেলে মাটি) এর জল ধারণক্ষমতা এঁটেল মাটি থেকে অপেক্ষাকৃতভাবে কম এবং শুষ্কতার হার তুলনামূলকভাবে বেশী।

24 নং চিত্রে হায়দ্রাবাদে 1901—1970 সাল পর্যন্ত দীর্ঘ 70 বছর ব্যাপী পরীক্ষায় তিনটি মাটিতে সাপ্তাহিক ব্যাপী মৃত্তিকায় জল জমা করে রাখার
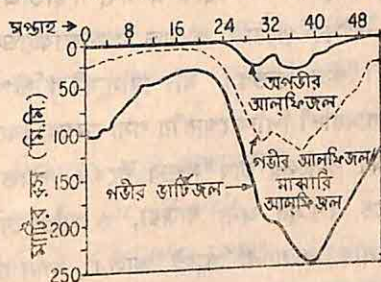
চিত্র 24 : তিনটি বিভিন্ন মাটিতে সাপ্তাহিক ব্যাপী জলের সঞ্চয়ের পরিমাণ (হায়দ্রাবাদ, ১৯০১-১৯৭০)।

ক্ষমতা দেখানো হয়েছে। সাধারণতঃ গভীর কালো মাটিতে লাল মাটি (গভীর ও ও অগভীর) অপেক্ষা জল জমা করে রাখার ক্ষমতা অনেক বেশী তা ভালভাবে প্রমাণিত হয়েছে। এই লেখচিত্র থেকে এইসব মাটিতে কোন্ সপ্তাহে কতটা জল ধরে রাখা যায়, সেই তথ্য থেকে শস্য চাষের পরিকল্পনা সহজেই করা যাবে।

ভার্টিজল বা কালোমাটিতে যেসব এলাকায় মাঝারি বৃষ্টিপাত হয়, সেইসব স্থানের জমিতে দো-ফসলী বা রেটুনিং (Ratooning) করা সম্ভব, যদি বর্ষাকালে উপরিভাগে জল নিষ্কাশন ব্যবস্থা এবং ঠিকমত লাঙ্গল পদ্ধতি উন্নত করা যায়। এছাড়া, যেখানে 625—1000 মিমি গড় বার্ষিক বৃষ্টিপাত হয়, সেখানে সাথী ফসল পদ্ধতি (Intercropping practices) চালু করে উৎপাদন বৃদ্ধি করার প্রভুত সুযোগ রয়েছে।

আগেই বলা হয়েছে, আজকাল আলোক সংবেদনহীন (photo-insensitive) উন্নত, স্বল্পমেয়াদী জাতের শস্যের বাছাই অনেকটা সম্ভব হয়েছে এবং এদের শুষ্কতা এড়ানোর ক্ষমতা (drought escaping ability) যথেষ্ট বেশী পাওয়া যায়। এইসব ফসলের জলদি জাত এবং বেশী সংখ্যক গাছ হওয়ার ক্ষমতা

রয়েছে। ধান, জোয়ার, বাজরা, ক্ষুদ্র দানাশস্য, সূর্যমুখী, কুসুম, রেড়ি, সরিষা, ডালশস্য যথা—মুগ, অড়হর, বরবটি এবং তুলা প্রভৃতির উপযুক্ত জাত আজ হাতের কাছেই পাওয়া যাচ্ছে। এর ফলে বিভিন্ন এলাকায় বিভিন্ন আবহাওয়ার মডেল ও বিভিন্ন প্রকার শস্য পর্যায় গড়ে তোলা সম্ভব। উদাহরণ-স্বরূপ, কতকগুলি সাধারণ আবহাওয়াজনিত অস্বাভাবিক অবস্থা (common weather aberrations) হ'ল—(1) মৌসুমী বৃষ্টিপাতের আগে বা পরে আগমন, (2) মৌসুমী বৃষ্টির দীর্ঘস্থিতি বা অনুপস্থিতি এবং (3) যৎ কিঞ্চিৎ বৃষ্টিপাত প্রভৃতি। এইসব প্রত্যেক অস্বাভাবিক আবহাওয়ায় বিভিন্ন প্রকার শস্যের তালিকা তৈরী করা সম্ভব। যদি মৌসুমী বৃষ্টিপাত খুব তাড়াতাড়ি শুরু হয়, তাহলে স্বল্পমেয়াদী শিম্বি গোত্রীয় শস্য নেওয়া যেতে পারে এবং তার সঙ্গে নিয়মিত মরসুমী ফসলের চাষ সম্ভব হবে। স্বাভাবিক বপনের জন্য জোয়ার, এবং দেরীতে বপনের জন্য বাজরা, ও আরো দেরীতে বপনের জন্য সিটেরিয়া প্রভৃতি শস্যের সম্ভাবনা খুবই ভাল। যখন মৌসুমী বৃষ্টিপাত দীর্ঘদিন অনুপস্থিত থাকে বা বাধাপ্রাপ্ত হয়, তখন খরা প্রভাবিত জোয়ার বা বাজরা ফসলের রেটুন করা সম্ভব হতে পারে। যে সব ফসলের অনির্ধারিত বা বা অস্পষ্ট বৃদ্ধি হয়, যেমন—রেড়ি বা অড়হর প্রভৃতি ফসলকে খুব তাড়াতাড়ি পুনর্জীবিত করা সম্ভব হয়। যদি দীর্ঘ খরা পরিস্থিতির পর বৃষ্টি আসে, তাহলে একবার ইউরিয়া স্প্রে করা যায়।

উত্তর-পশ্চিম উত্তরপ্রদেশে উন্নত জল্দি জাতের অড়হরের উন্নয়ন সম্ভব হয়েছে এবং এর দ্বারা গমের আগে একটি ডালশস্য অনায়াসে নেওয়া সম্ভব হচ্ছে। তাই, যেহেতু অড়হরের জল্দি জাত এখন পাওয়া সম্ভব হয়েছে, উত্তর ভারতে জুলাই এবং ডিসেম্বরের মধ্যে এইরূপ একটি ডালশস্যের চাষ খুবই সম্ভব। তখন শিশির বা শীতকালীন বৃষ্টির সাহায্যে একই জমিতে সূর্যমুখীর চাষ ফেব্রুয়ারী থেকে এপ্রিলের মধ্যে করা যাবে। রবি মরসুমে উত্তর ভারতে তাই শিশিরের সাহায্যে ভালভাবে এইসব শস্য চাষ করা সম্ভব। আর. ডি. আসানার মত একজন খ্যাতনামা উদ্ভিদ শারীরতত্ত্ববিদ (Plant physiologist) গম গাছের একটি মডেল উন্নয়ন করেছেন, যার শিশির ধরে রাখার ক্ষমতা আছে। অন্যান্য বৃষ্টি-নির্ভর সমস্ত রবি মরসুমের ফসলের ক্ষেত্রে এরূপ ব্যাপক গবেষণা আজ একান্তই প্রয়োজন। তাই আজ আমাদের প্রত্যেক মাটি ও বৃষ্টিপাত যুক্ত এলাকার জন্য

একটি বিকল্প শস্য চাষের নমুনা গুচ্ছ বিভিন্ন সম্ভাব্য আবহাওয়াতে খাপ খাওয়ানোর জন্য তৈরী করতে হবে। এরজন্য অবশ্যই আমাদের প্রয়োজনীয় বীজ ও সারের চলতি গুদাম ঘর (Buffer godown) প্রস্তুত করতে হবে ও বিকল্প শস্য তালিকা অভ্যাস করার জন্য যৌথ অধিকার যুক্ত বীজতলা প্রস্তুত করতে হবে।

প্রত্যেক খরাপ্রবণ এলাকার জন্য একটি **'খরা সংহিতা** বা **নিয়মাবলী'** (Drought code) দরকার। এর সাহায্যে ঐ খরাপ্রবণ এলাকার উন্নয়ন কার্যের জন্য নির্দিষ্ট প্রশাসনিক বিভাগের পক্ষে স্থানীয় কৃষকদের বিভিন্ন আবহাওয়ার নমুনায় উপযুক্ত শস্যচাষের উপদেশ দেওয়া সম্ভব হবে (স্বামীনাথন, 1979)।

শুষ্ক এলাকায় চাষবাসের মূল ধারণাসমূহ এবং কলাকৌশল (Basic concepts & Practices for Dry Farming Areas)

এলাকা ভিত্তিক নির্দিষ্ট সুপারিশসহ সমস্ত শুষ্ক এলাকার চাষ পদ্ধতিতে সাধারণভাবে সুষ্ঠ শস্য চাষে যে সব মূল ধারণা এবং কলাকৌশলের প্রয়োগ প্রয়োজন, সেগুলি এক কথায় নিম্নরূপ—

(1) মাটি ও জলের মূল সংস্থান সংরক্ষণ করা,

(2) শস্য উৎপাদনের জন্য সংরক্ষিত সংস্থান সমূহের সর্বোত্তম ব্যবহার, এবং

(3) অস্বাভাবিক মরসুমের জন্য সম্ভাব্য ঘটনার পরিকল্পনা প্রস্তুত করা।

এরজন্য (ক) **মাটি ও জলের পরিচর্যা** এবং (খ) **শস্য পরিচর্যা**, এই দুটি বিষয়ের বিভিন্ন দিক সম্বন্ধে আমাদের মূল ধারণাগুলি ও তাদের কলা-কৌশল সম্বন্ধে আগে থাকতে যথেষ্টভাবে ওয়াকিবহাল হতে হবে।

(ক) **মাটি ও জলের পরিচর্যা**

(1) **মাটি ও জলের সংরক্ষণ ঃ** শুষ্ক এলাকায় আগে মাটির ক্ষয় ও অধিক বৃষ্টির জল ধরে রাখার উপর বিশেষ গুরুত্ব দিতে হবে। এরজন্য জমির বিভিন্ন উঁচু-নীচু অবস্থানে মাটি ও জলের সংরক্ষণের জন্য গ্রেডেড্ বাঁধ, জমি সমতল করা এবং অন্যান্য ব্যবস্থাদি নিতে হবে।

(2) **গভীর কালো মাটির পরিচর্যা ঃ** দাক্ষিণাত্যের নিম্ন বৃষ্টিপাতযুক্ত এলাকায় বপনের তারিখ এগিয়ে এনে এবং স্বল্পমেয়াদী ফসলের জাত নির্বাচন করে মধ্য জানুয়ারীর ভেতর রবি ফসলের চাষে বিশেষ গুরুত্ব দিতে হবে।

(3) **লাল মাটির পরিচর্যা ঃ** এরূপ মাটিতে শক্ত হয়ে যাওয়া কঠিন আবরণ (soil crusting) একটি সাংঘাতিক সমস্যা। এর ফলে বৃষ্টির জল দ্রুত গড়িয়ে যায়। এরজন্য মরসুমের আগে লাঙ্গল দিয়ে (off-season tillage) দেওয়া দরকার। এতে মাটির শক্ত আবরণ ভেঙ্গে বৃষ্টির জলকে নীচে প্রবেশ করতে সাহায্য করবে এবং অতিরিক্ত জল কম গড়িয়ে যাবে।

(4) **ঢালু জমির পরিচর্যা ঃ** ভুবনেশ্বর এবং ছোটনাগপুর এলাকার (পশ্চিমবঙ্গের পুরুলিয়া, বাঁকুড়া, মেদিনীপুর পশ্চিম, বীরভূম ও বর্ধমানের পশ্চিমাংশ প্রভৃতি সহ) মাটি সাধারণত পাথুরে নুড়িযুক্ত, মাঝারি অবস্থানের বেলে-দোআঁশ ও দোআঁশ-বেলে যুক্ত ও নীচু অবস্থানে বালু—কাদা যুক্ত। জমির অবস্থান উঁচু-নীচু। এরূপ বিভিন্ন অবস্থানে স্বভাবতই শস্যের চাষ ভিন্নতর। বাজরা বা রাগীর মত কম জল-চাহিদাযুক্ত ফসলের চাষ উঁচু এলাকায় সম্ভব হতে পারে। কিন্তু এসব এলাকায় ধানের সম্ভাবনাপূর্ণ ভাল ফলন কেবলমাত্র নীচু এলাকাতেই সম্ভব। এই দুই অবস্থানের মাঝামাঝি জমিতে ভুট্টা প্রভৃতি ফসলের চাষ করা যেতে পারে।

(5) **মাটি সংশোধনী দ্রব্য** (Soil amendments) ঃ ল্যাটেরাইট ও লাল মাটি অঞ্চলে (বাঙ্গালোর, ভুবনেশ্বর এবং রাঁচী এলাকায়) 2—4 কুইণ্টাল/হেক্টার হারে চুন ব্যবহার করে পরিবর্তিত অম্লত্ব প্রশমিত করা যায়। তাছাড়া, এইসব মাটিতে ফসফেটজনিত সারের ব্যবহার মাটির নীচে গাছের শিকড়ের কাছাকাছি ব্যবহার করা দরকার (band placement)। এইসব মাটিতে 4—5 কু./হে- হারে **জিপসাম** ব্যবহারে **চীনাবাদাম** চাষে বিশেষ সুফল পাওয়া যায়।

(খ) **শস্য পরিচর্যা**

(1) **বীজ ঃ** ভাল মানের ও উন্নত জাতের বীজ থেকেই অধিক উৎপাদন পাওয়া সম্ভব। এছাড়া বীজের আকার একরকম হওয়া আর একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়, বিশেষ করে চীনাবাদাম প্রভৃতি শস্যের ন্যায় বড় দানা জাতীয় শস্যের ক্ষেত্রে। সব সময়ই সংশিত বীজাগার থেকে বীজ কেনা উচিত। এতে গাছের সংখ্যা ভাল হয়। একটি নির্দিষ্ট এলাকার জন্য নির্দিষ্ট সংকর বা উন্নত জাতের বীজ এমনভাবে বাছাই করতে হবে, যাতে পাখীর হাত থেকে ক্ষতি বা নির্দিষ্ট রোগ-পোকার আক্রমণ এবং ক্ষয়ক্ষতি থেকে নিশ্চিত হওয়া যায়।

অড়হর এবং রেড়ির বীজের মত **বর্ণ-সংকর পরাগরেণু বাহিত বীজ** থেকে বিশুদ্ধতা সংরক্ষণ করতে হবে।

(2) **বোনার সময়ঃ** খরিফ শস্যের জল্‌দি বপন খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এতে ভাল চারা পাওয়া যাবে এবং রোগপোকার আক্রমণ থেকে দূরে থাকা যাবে। যেমন, বাজরার **ডাঁটা মাছি** (shoot fly) এবং **ডাউনি মিলডিউ** (downy mildew) বা বাজরার আরগট (ergot) প্রভৃতি থেকে তাড়াতাড়ি দ্বিতীয় ফসলের জন্য জমি খালি করে দেওয়ার ফলে (আকোলা ও ইন্দোর এলাকা) রেহাই পাওয়া যায়। এর জন্য মরসুমের আগে বীজতলার জন্য জমি প্রস্তুত করতে হবে, সারির দূরত্ব বাড়াতে হবে। কিন্তু গাছের সংখ্যা ঠিক রাখতে হবে এবং কিছু কিছু এলাকায় শুকনো বীজ বপন করতে হবে (যেখানে নিশ্চিতভাবে কিছুদিন পরে বৃষ্টি আশা করা যায়)। যেমন, ইন্দোরে তুলা, রাঁচীতে ধান এবং হিসারে বাজরা প্রভৃতি এইভাবে বোনা হয়।

(3) **শস্যের ঘনত্ব** (Crop density)**ঃ** শস্যের নতুন উচ্চফলনশীল জাত (সংকরজাত সহ) দেশীজাত অপেক্ষা বেশী ঘনত্বে লাগিয়ে অধিকতর ফলন উৎপাদন করে। গাছের ভাল সংখ্যার জন্য বেশী করে বীজের হার, উত্তম সুপুষ্ট বীজ এবং বোনার পদ্ধতি বিষয়গুলির উপর বেশী গুরুত্ব দিতে হবে। সাধারণত বীজ বপন যন্ত্রের সাহায্যে বীজ বুনলে "কেরা" পদ্ধতি (লাঙ্গলের পিছনে বীজ বোনা ও ফলার সাহায্যে ঢেকে দেওয়া) অপেক্ষা গাছের সংখ্যা অনেক বেশী ভাল হয়।

(4) **সার ব্যবহারঃ** **জল ও সার ব্যবহার**—এই দুটি হ'ল শুষ্ক এলাকার চাষ পদ্ধতিতে প্রধান বাধা। নিম্ন থেকে মাঝারি মাত্রায় সার ব্যবহারে শুষ্ক এলাকায় খুব ভাল সুফল পাওয়া গেছে। যখন অন্যান্য কৃষি উপাদানগুলির সুষ্ঠ পরিচর্যা সম্ভব হয়, তখন সার ব্যবহারে সর্বোত্তম সুফল পরিলক্ষিত হয়। **খরিফ মরসুমে** যেখানে **ফসফেট** ঘটিত সার মূল সার হিসাবে একবারেই মাটির নীচে দেওয়া ভাল, সেখানে নাইট্রোজেন সার 2—3 বারে দেওয়া খুব ভাল। **রবিতেও** ফসফেট সার মাটির গভীরে দেওয়া উচিত এবং নাইট্রোজেন সার একইভাবে 2—3 বারে প্রয়োগ করলে ভাল ফল পাওয়া যায়।

(5) **আগাছা দমনঃ** আগাছা দমনে অবহেলা করা উচিত নয়। ঠিক সময়ে আগাছা দমনের উপর গুরুত্ব দিতে হবে, বিশেষ করে **খরিফ** মরসুমে ফসল

চাষে। শস্যের 3—4 সপ্তাহের মাথায় যে কোন পদ্ধতিতেই হোক না কেন, (হাত দিয়ে তুলে বা আগাছানাশক ঔষধ ব্যবহার করে), আগাছা দমনের অবশ্যই চেষ্টা নিতে হবে। সারা বছর ধরে চাষ করলে সাধারণত আগাছা কম জন্মায়। সারির মাঝের দূরত্ব চওড়া করলে সময়মত আগাছা দমনে ও মাধ্যমিক পরিচর্যার কাজে বিশেষ সুবিধা হয় বা বলদ টানা বিদা বা লাঙ্গলের ফলার সাহায্যে আগাছা দমন এবং মাটি আলগা করা যায়।

সপ্তম অধ্যায়

শুষ্ক এলাকার চাষ পদ্ধতি

(Farming Systems Technology for Semi-Arid Tropics)

এশিয়া, আফ্রিকা এবং ল্যাটিন আমেরিকায় শুষ্ক এলাকায় কৃষকরা দীর্ঘ অভিজ্ঞতায় দেখেছেন যে, কৃষিতে কোন প্রকার নিশ্চয়তা নেই। কারণ প্রকৃতি নিজেই নিজের ভবিষ্যৎবাণী করতে অক্ষম। সেজন্য সমস্ত **শুষ্ক এলাকার চাষ পদ্ধতি** একটি **অত্যন্ত অনিশ্চিত** অবস্থার মধ্যে চলে। এই অনিশ্চিত খরা বা **বন্যার** ঝুঁকির জন্য এইসব শুষ্ক এলাকার কৃষকরা তাই সর্বদা উচ্চফলনশীল শস্যের জাত, সুষম সার ও অন্যান্য কৃষি উপাদান যখন যা হাতের কাছে পাওয়া যায়, তাদের ব্যবহার করে থাকে। এইজন্য শুষ্ক তথা খরাপ্রবণ এলাকায় **পরিবর্তনশীল উৎপাদন ও শস্যের নিম্নফলন** একটি সাধারণ ঘটনা। অনেক দেশেই তাই এরূপ পরিবেশগত এলাকায় ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার নিম্নতম খাদ্য চাহিদা মেটাতে শুষ্ক চাষ পদ্ধতি ব্যর্থ হয়েছে (জ্যাকব ক্যাম্পেন, 1979)।

The Consultative Group on International Agricultural Research (CGIR) অসেচ শুষ্ক এলাকায় মাটি ও জল পরিচর্যা এবং অন্যান্য অবরোধ বা বাধাসমূহ, **শস্য উৎপাদন পদ্ধতির** উপযুক্ত প্রযুক্তিবিদ্যার অভাব প্রভৃতির প্রাথমিক স্বীকার করেছেন। তাই ICRISAT-এ বিভিন্ন প্রকার চাষ পদ্ধতিতে গবেষণার উপর বিশেষ জোর দেওয়া হয়। **এই চাষ পদ্ধতি গবেষণা পরিকল্পনার** (Farming Systems Research Program বা FSRP) প্রধান উদ্দেশ্যগুলির যথাযথ প্রয়োগ নিম্নরূপ—

(1) উপযুক্ত চাষ পদ্ধতির উন্নতি বিধান, যার সাহায্যে মরসুমভিত্তিক শুষ্ক তথা খরাপ্রবণ এলাকার প্রাকৃতিক ও মানুষের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত সমস্ত উপাদানের সুষ্ঠু ও সর্বোৎকৃষ্ট ব্যবহার করে কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি করা যাবে ও উৎপাদন অপরিবর্তনশীল রাখা যাবে।

(2) জাতীয় এবং প্রাদেশিক (National & Regional) গবেষণা প্রকল্পগুলিকে যথাযথভাবে সমন্বয় করে তাদের সহযোগিতা করা এবং বিভিন্ন প্রশিক্ষণ,

ও আলোচনাচক্রের মাধ্যমে এইসব এলাকায় ব্যাপক সম্প্রসারণ ও চাষ পদ্ধতির উন্নতি করা।

FSRP-এর উদ্যমের মূল লক্ষ্য নিম্নরূপ—

(1) অর্থনৈতিক সচেতনতায় শ্রম-নিবিড় প্রযুক্তিবিদ্যার সৃষ্টি করে উৎপাদনশীল প্রাকৃতিক উপাদানসমূহের সর্বোত্তম উন্নতি, ব্যবহার এবং সংরক্ষণ করা।

(2) উন্নত মাটি ও জল পরিচর্যা পদ্ধতির জন্য বিশেষ প্রযুক্তিবিদ্যার উন্নতিসাধন করা, তাদের শুষ্ক ঋতুতে কার্যকরী করা এবং এর ফলে অতিরিক্ত কর্মনিযুক্তি বৃদ্ধি পাবে।

(3) শুষ্ক এলাকায় বসবাসকারী জনগণের আর্থিক অবস্থা তথা জীবনের মান উন্নতি করার জন্য শস্য চাষ পদ্ধতিগুলির উন্নতি করে সামগ্রিক উৎপাদন বৃদ্ধি করা।

এই লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য পূরণের জন্য FSRP যে সব কাজের অন্তর্ভুক্তি করেছে, তা নিম্নরূপ—

(1) শুষ্ক অঞ্চলে বর্তমানস্থিত অনেক গবেষণা এলাকার মূল পরিসংখ্যানের বিশদ ব্যাখ্যা ও তাদের একত্রিকরণ এবং যথাযথ প্রয়োগ,

(2) মূল ও ব্যবহারিক গবেষণালব্ধ ফলাফলের মধ্যে আত্মিক যোগসূত্র গড়ে তুলে শুষ্ক এলাকার চাষপদ্ধতির উন্নতি সাধন করা,

(3) জলবায়ু, মাটি ও শস্য চাষ পদ্ধতির এলাকাভিত্তিক সমস্যা জেনে অঞ্চলভিত্তিক শস্য চাষ পদ্ধতির উপর ব্যাপকতা বাড়ানো এবং চাষের বিভিন্ন মডেল তৈরী করা,

(4) আন্তর্জাতিক তথা প্রাদেশিক রাজ্য স্তরে বিভিন্ন শুষ্ক এলাকা গবেষণা সংস্থার মধ্যে যোগসূত্র এবং সমন্বয় গড়ে তোলা ও বিভিন্ন কারণের পুঙ্খানুপুঙ্খ তথ্যের বিশদ ব্যাখ্যা করা,

(5) চাষ পদ্ধতি গবেষণার জন্য বিভিন্ন জায়গা থেকে বিশেষজ্ঞ এনে বিশেষ ট্রেনিংয়ের ব্যবস্থা করা এবং সর্ব বিষয়ে সাহায্য বা সুপারিশ পত্র দেওয়া,

(6) বিশেষ ধারা পদ্ধতিতে গবেষণার উন্নয়ন এবং অনেক বিষয়ের উপর মৌলিক ও সমর্থনীয় গবেষণা চালানো,

(7) বিভিন্ন সংস্থানের উন্নয়ন (Resource development) ও পরিচর্যা, শস্য উৎপাদন এবং নির্বাচিত এলাকায় সংস্থান সংরক্ষণের উপর পারস্পরিক শৃঙ্খলাবোধ গবেষণার ফলাফল পর্যালোচনা প্রভৃতি।

FRSP জোরদার করা ও তার যথাযথ প্রয়োগ-উন্নয়নের কতকগুলি প্রধান সমস্যার প্রতি বিশেষ নজর দেওয়া কর্তব্য, যেমন—

(1) ভারতবর্ষের প্রায় 18 মিলিয়ন হেক্টার গভীর ভার্টিজল জমি এবং আফ্রিকায় বর্ষাকালে কয়েক মিলিয়ন হেক্টার জমি পতিত থাকে। এইসব শস্যহীন খোলা মাটিতে বৃষ্টিকালে সাংঘাতিকভাবে জল গড়িয়ে যায় এবং মাটির ক্ষয় হয়।

(2) ভারতের এ্যালফিসল এলাকা এবং অন্যান্য একই মাটিযুক্ত এলাকায় বৃষ্টিকালে প্রচুর পরিমাণ জল গড়িয়ে নষ্ট হয়। বর্ষাকালের ফসল প্রায়ই জলের অবরোধে মার খায়। ভারতবর্ষে ধান এবং আখ প্রভৃতি প্রধানত কুঁয়া বা ছোট ছোট পুকুর প্রভৃতির জমা জলে চাষ হয়। এই জমা জলের সর্বোত্তম ব্যবহার করে কিভাবে অন্যান্য ফসল চাষের উৎপাদন আরও বাড়ানো যায়, তার জন্য আমাদের আরও ব্যাপক গবেষণার প্রয়োজন।

(3) সাথী ফসল চাষে (Inter cropping) বিশেষ পদ্ধতি অবলম্বন করে অধিক উৎপাদন বৃদ্ধি করার জন্য অন্যান্য উপাদানের সর্বোত্তম ব্যবহার সংরক্ষণ প্রভৃতি অপরিহার্য।

(4) মাটি ও জলের আধুনিক সংরক্ষণ ব্যবস্থাসমূহ কার্যকরী করে উৎপাদন বৃদ্ধি করতে হবে।

(5) মাটির উর্বরতা বৃদ্ধিতে জৈব পদার্থের ব্যবহার এবং শিম্বিগোত্রীয় ফসল চাষ করে বায়বীয় নাইট্রোজেন বন্ধন, সুষম রাসায়নিক সারের অর্থনৈতিক ব্যবহার প্রভৃতি শস্য উৎপাদন বৃদ্ধিতে অপরিহার্য।

(6) বৃষ্টির জলই যেহেতু একমাত্র সংস্থান, তাই অতিরিক্ত জল জমা করে রাখার জন্য মাঠের মধ্যে জলের খাঁচা (watershed or catchment) যেখানে করলে সব থেকে বেশী জল গড়িয়ে জমা হবে, সেইভাবে করা দরকার।

(7) শুষ্ক এলাকায় মাটি—গাছ—বাতাসের আন্তঃসম্পর্ক এবং আবহাওয়ার পরিসংখ্যান পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে পর্যালোচনা করে চাষ পদ্ধতির মডেল তৈরী করা দরকার।

(8) রানঅফ্, ক্ষয়, জল নিষ্কাশন, মাটিতে জল প্রবেশের হার (infiltration rate), মাটির নীচে জলস্তরের অবস্থান প্রভৃতি ছোট ছোট জমিতে ঠিকমত বোঝা যায় না। তাই এইসব কারণসমূহ ভাল করে অনুধাবন করা প্রয়োজন।

(9) কম দামের প্রয়োজনীয় এবং দক্ষ কৃষি যন্ত্রপাতি ব্যবহার করে মাটি, জল এবং শস্য পরিচর্যা পদ্ধতির দক্ষতা বৃদ্ধি করতে হবে এবং এতে আগাছা দমনের বিশেষ সুবিধা হবে।

(10) সাধারণতঃ শুষ্ক এলাকায় কৃষকদের গবাদি পশু তথা তাদের নিজেদের শক্তি ভালভাবে যাতে কাজে লাগাতে পারে, সেদিকে নজর দিতে হবে।

(11) স্থানীয় কৃষকদের চাহিদা অনুযায়ী কার্যকরী পদ্ধতি গবেষণার (operational research) উপর বিশেষ জোর দিতে হবে।

(12) উন্নত জাত, শস্য চাষ পদ্ধতি, সার এবং শস্য পরিচর্যা পদ্ধতির সাহায্যে হাতের কাছে লব্ধ সংস্থানের সর্বোত্তম ব্যবহারের উপর বিশেষ গবেষণা করতে হবে।
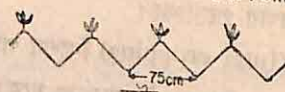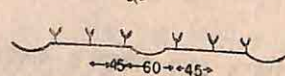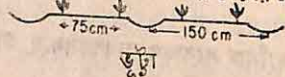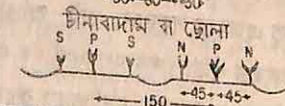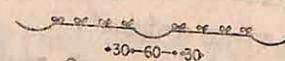
চিত্র 25 : বিকল্প চাষ পদ্ধতি এবং চওড়া আলে বিভিন্ন দৈর্ঘ্যের সারি ও তাদের সুফল।

25 নং চিত্রে BBF পদ্ধতিতে বিভিন্ন দক্ষ বিকল্প চাষপদ্ধতি এবং চওড়া আলের (150 সেমি) সারি তৈরী করে ভুট্টা, জোয়ার, চীনাবাদাম, অড়হর/

জোয়ার সাথী ফসল বা অড়হর/ভুট্টার সাথী ফসলের দক্ষ চাষ পদ্ধতি বোঝানো হয়েছে। এই চওড়া আল বা কেয়ারির বিস্তার 100 সে.মি. এবং তার পাশের বসা নালা প্রায় 50 সে. মি. হয়। এইসব চওড়া কেয়ারিতে 2—, 3— বা 4— সারিতে 75—, 45— এবং 30—সে.মি. সারির দূরত্বে দক্ষভাবে গাছ লাগান যায়। গভীর ভার্টিজলে এই পদ্ধতি খুবই কার্যকরী। 19 এবং 21 নং ছবিতে এই সব কেয়ারিও নালাগুলির নির্মাণ ভালভাবে দেখানো হয়েছে। দেখা গেছে, সমতলে গাছ লাগান থেকে BBF পদ্ধতিতে ফসল চাষের সুবিধা এবং উৎপাদন অনেক বেশী, বিশেষ করে গভীর ভার্টিজলে।

গভীর ভার্টিজলে BBF পদ্ধতিতে শস্য চাষ করলে ক্ষয় এবং রান্ অফ অপেক্ষাকৃত কম হয়। এর কারণ হল, বৃষ্টিকালে অতিরিক্ত জল নালা দিয়ে একটা নিয়ন্ত্রিত গতিতে গড়ায়, বিশেষ করে ঢালু এলাকাতে। এছাড়া এতে বর্ষাকালে জল নিষ্কাশন ব্যবস্থারও খুব সুবিধা হয়। ICRISAT-এর ভার্টিজলে নালাগুলির সর্বোত্তম ঢাল অবস্থা 0·4 থেকে 0·8 -এ নির্মাণ করা হয়ে থাকে।

জলের খাঁচার উপর কার্যকরী গবেষণার ক্ষেত্রে (operational-scale research on water sheds) **BBF পদ্ধতিতে যেসব সুবিধা পাওয়া যায়,** তা সংক্ষেপে এরূপ—

(1) মাটির ক্ষয় রোধ হয়।

(2) মাটির জল নিষ্কাশন ব্যবস্থা সুষ্ঠভাবে করা যায়।

(3) গাছের শিকড়ের কাছে যে জৈবসার এবং সার জমা হয়, তা ধুয়ে চলে যায় না।

(4) গাছের বৃদ্ধি-এলাকাতে মাটি জমাট বাঁধে না।

(5) অতিরিক্ত জলের যোগানে সহজেই পরিবর্তনযোগ্য হয়।

(6) স্থায়ীভাবে এই পদ্ধতিতে দীর্ঘদিন চাষ করা সম্ভব।

(7) কম কর্ষণে ভাল ভাবে রক্ষা করা যায়।

(8) শুষ্ক মরসুমে জমি তৈরীতে বিশেষভাবে সাহায্য করে। 26নং ছবিতে বাজরা চাষে **লাঙ্গলের প্রভাব** এবং লাঙ্গলের সময়কালের উপর জোয়ার/জোয়ার এবং বরবটি/জোয়ার শস্য পর্যায়ের দৃষ্টান্ত দেওয়া হয়েছে। দেখা

গেছে, অক্টোবরে লাঙ্গল করে বরবটি/জোয়ার শস্য-পর্যায় খুবই উৎসাহ জনক ফলন দেয়, বিশেষ করে অগভীর পাথুরে মাটিতে। বিনা লাঙ্গল, অক্টোবরে এবং
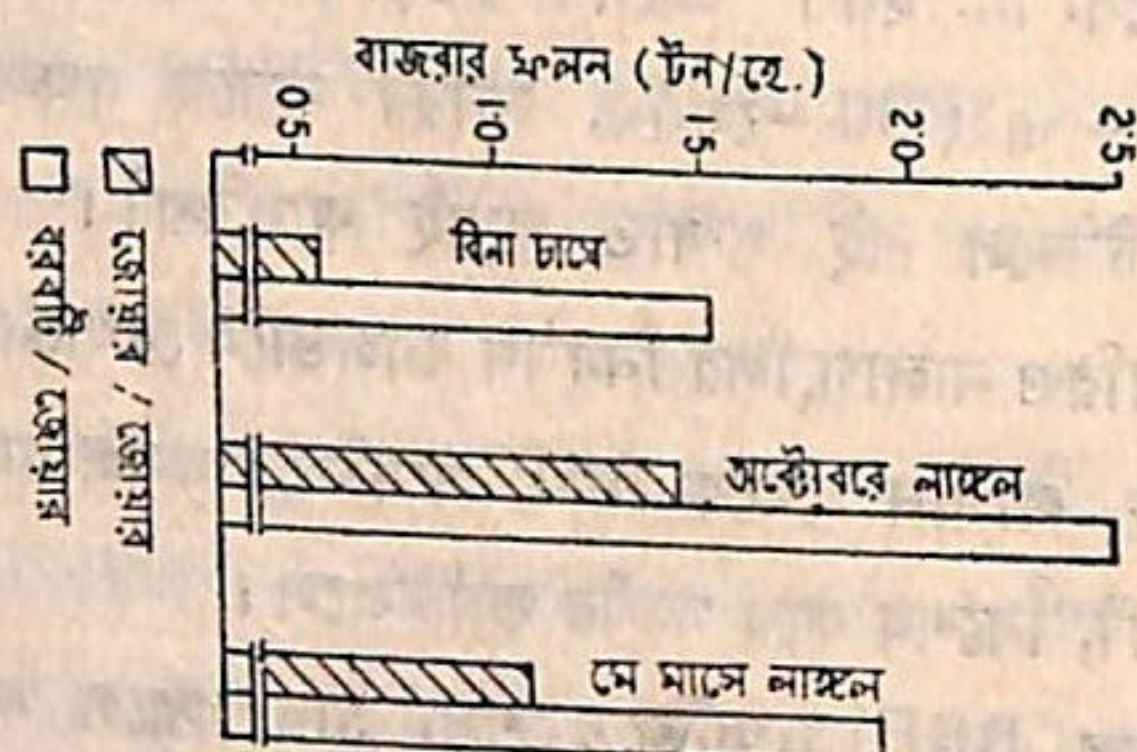
চিত্র 26 : অগভীর পাথুরে মাটিতে জোয়ার-জোয়ার, বরবটি-জোয়ার চাষ পদ্ধতিতে লাঙ্গল এবং বিনা চাষের প্রভাব।

মে মাসে লাঙ্গল করে এই দুই প্রকার শস্য পর্যায়ের বেশ তুলনা মূলক উৎসাহ জনক উৎপাদন সহজেই লক্ষ্য করা যায়। এতে সাধারণ কৃষকরা তাদের পাথুরে অগভীর মাটিতে অনুরূপ চাষ পদ্ধতি অবলম্বন করতে পারবে।

সম্ভাবনাময় ফসল (Potential Crops)

বেশ কিছু ব্যবহারিক গবেষণা পরীক্ষাক্ষেত্রের (applied research trials) ফলাফল পর্যালোচনা করে দেখা গেছে সম্ভাবনাময় উঁচু স্থানের ফসল হিসাবে প্রথম ফসল ধান চাষের পর দ্বিতীয় ফসল মিষ্টি আলু, বাজরা, ভুট্টা, মটর, সয়াবীন, বরবটি, মুগ প্রভৃতি ভালভাবে উৎপন্ন করা যায় (চিত্র 28) এবং এদের আবার তৃতীয় ফসল হিসাবে ও নেওয়া সম্ভব।

প্রথম ফসল ধান মে অথবা জুনের প্রথমে বৃষ্টি শুরু হওয়ার সময় সরাসরি জমিতে লাগানো যায় (direct-seeded rice)। ভারী নীচু মাটিতে দ্বিতীয় ফসল ও ধান নেওয়া যেতে পারে। তবে শুষ্ক অবস্থায় বোনা ধান তোলার পর (মে—আগষ্টে) উঁচু অবস্থানের জমিতে মিষ্টি আলু, বাজরা, ভুট্টা, সয়াবীন, মটর, মুগ বরবটি প্রভৃতি ফসল (আগষ্ট—নভেম্বর) ভালভাবে চাষ করা সম্ভব। ভারী মাটিতে জল ধারণ ক্ষমতা হাল্কা মাটি অপেক্ষা বেশী বলেই নীচু অবস্থানে দু'বার স্বল্পমেয়াদী উচ্চ ফলনশীল ধান (আই. আর. 30, আই. আর 1561 প্রভৃতি) ভালভাবে চাষ করা সম্ভব। তৃতীয় ফসল হিসাবে নভেম্বর—মার্চের

মধ্যে ও উঁচু এলাকায় মিষ্টি আলু, বাজরা, ভুট্টা, সয়াবীন, বরবটি, মুগ প্রভৃতির চাষ খুবই সম্ভাবনা পূর্ণ (চিত্র 28)।
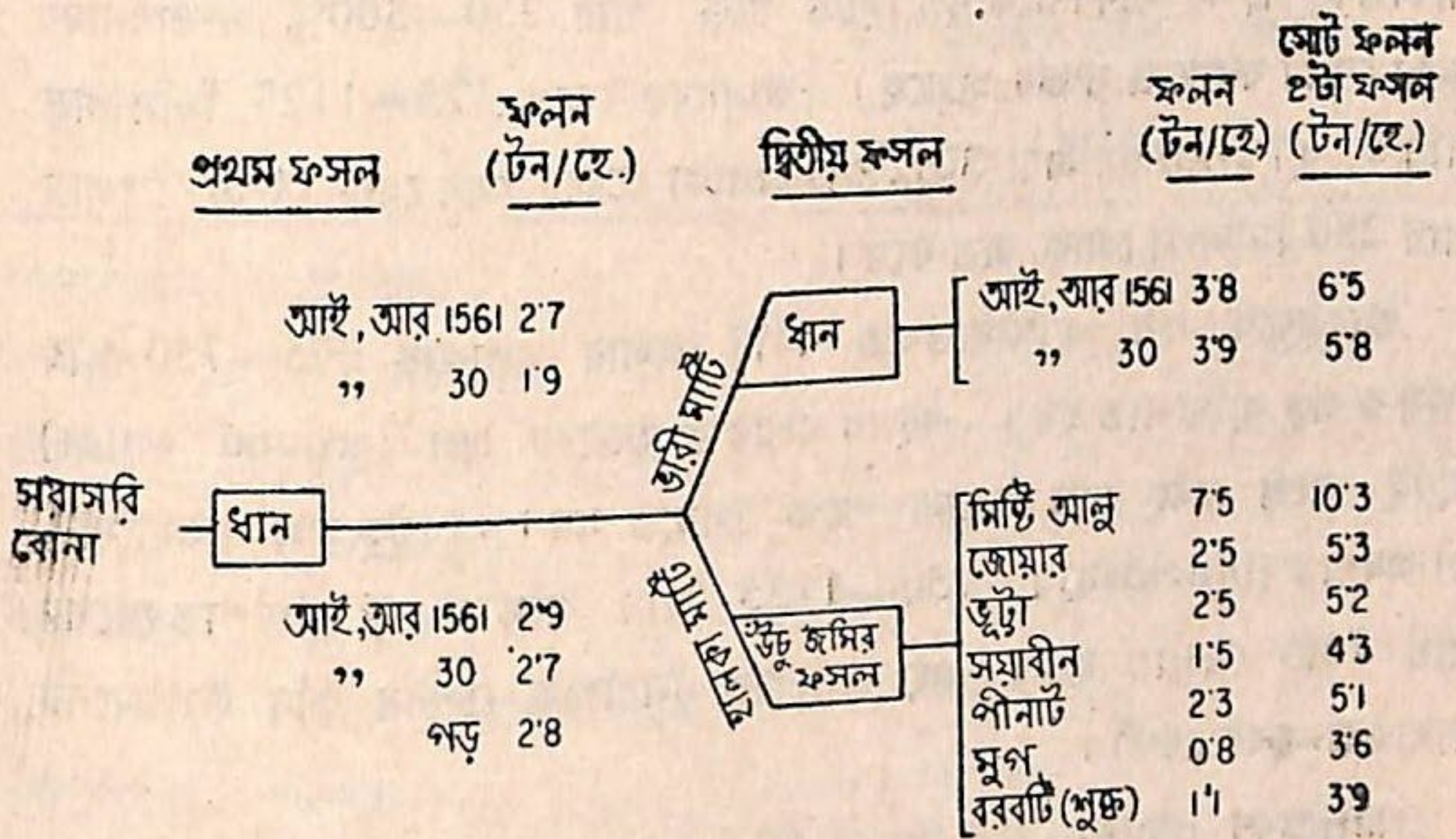
চিত্র 27 : ভারী মাটিতে দুবার ধান অথবা হাল্কা মাটিতে ধান ও অন্যান্য 7টি ফসলের সম্ভাবনাপূর্ণ উৎপাদন (5 মাস শুষ্ক অবস্থার সময়)।
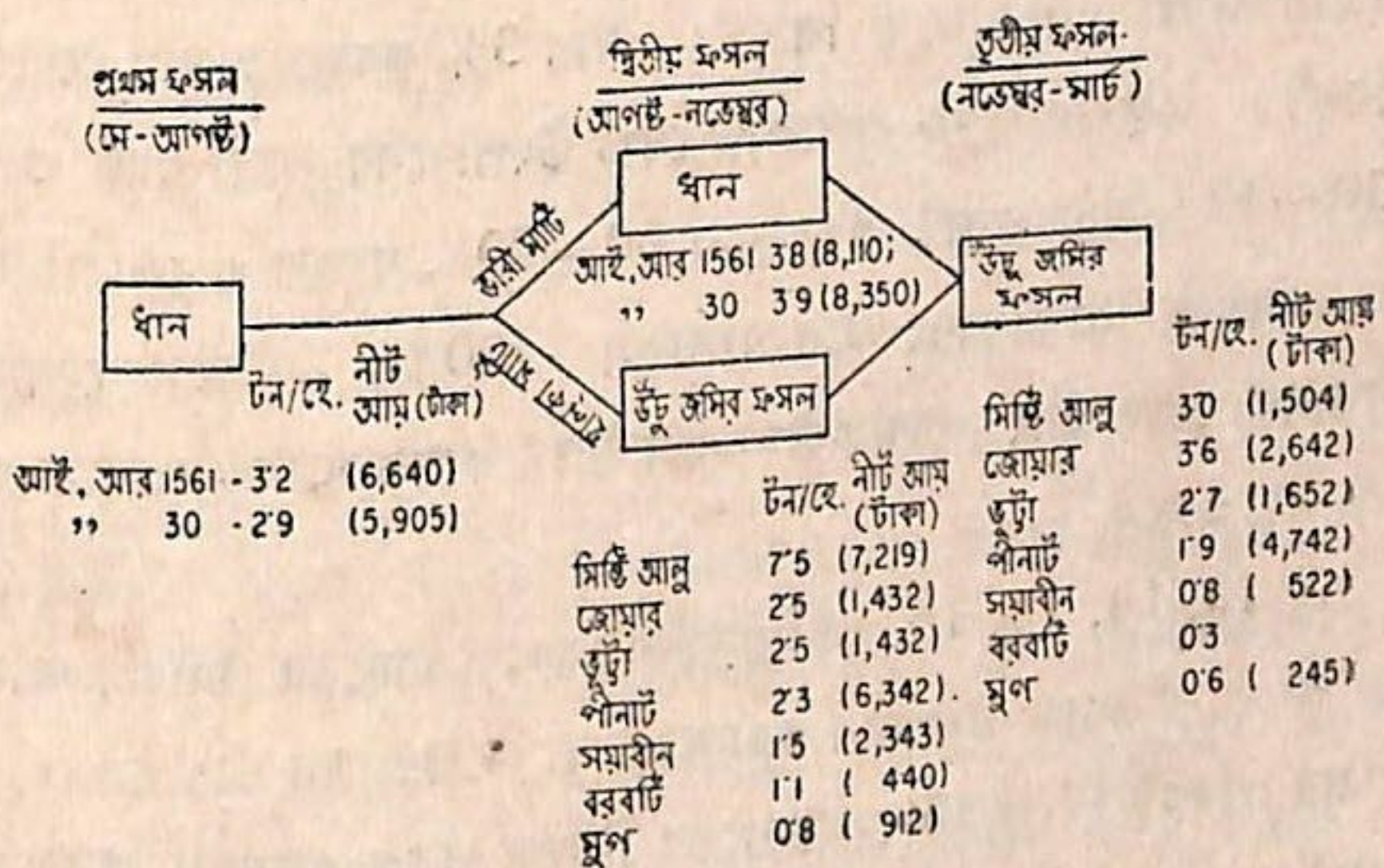
চিত্র 28 : শুষ্ক এলাকায় বিকল্প শস্য চাষ পদ্ধতি।

একইভাবে ভারী এবং হাল্কা মাটির নীচু ও উঁচু অবস্থানে দুবার ধান ও ধান—মিষ্টি আলু, জোয়ার, সয়াবীন, মুগ, বরবটি প্রভৃতি ফসলের সম্ভাবনা খুবই সম্ভাবনাপূর্ণ (চিত্র 27)।

ভারতবর্ষের 75% চাষ যোগ্য জমির যেখানে 42% শুষ্ক তথা খরা প্রবণ এলাকা রয়েছে, সেখানে আধুনিক শুষ্কে চাষ পদ্ধতি প্রযুক্তিবিদ্যার সাহায্যে 23টি আঞ্চলিক শুষ্ক গবেষণাকেন্দ্রগুলিতে গড়ে প্রায় 250—300% সম্ভাবনাময় ফলন বেশী ফলানো সম্ভব হয়েছে। আমাদের দেশে 375—1125 মিমি গড় বার্ষিক বৃষ্টিপাত হয় এবং 30% সেচ এলাকা রয়েছে এমন মোট 11·5টি জেলায় প্রায় 280 মিলিয়ন লোক বাস করে।

ভারতবর্ষে কম বৃষ্টিপাতযুক্ত 41টি জেলার এলাকায় 375—750 মিমি বার্ষিক গড় বৃষ্টিপাত হয়। এইসব এলাকায় ভূস্তরের জল (ground water) খুবই স্বল্প এবং শস্য চাষের পক্ষে উপযুক্ত নয়। যতটুকু জল পাওয়া যায়, তা লবণাক্ত (brackish)। 750—1125 মিমি বার্ষিক গড় বৃষ্টিপাত দেশের প্রায় 74টি জেলায় হয়। এই এলাকায় নিয়ন্ত্রিত চেষ্টায় কৃষি উৎপাদনের সম্ভাবনা খুবই বেশী।

খরা প্রবণ এলাকায় প্রায় দেশের 60 মিলিয়ন হেক্টার জমি রয়েছে এবং 72টি জেলায় শুষ্ক ও অর্ধশুষ্ক এলাকা বর্তমান ও 60 মিলিয়ন লোকের বাস। ভারতের অনেক শুষ্ক জেলায় মোট জমির প্রায় 70—90% চাষযোগ্য জমি বর্তমান। যাইহোক, প্রায় 54% জোতজমিই 1 হেক্টারেরও কম এবং এইসব ছোট ছোট জোতগুলি 3-4টি খণ্ডে বিভক্ত। মাত্র 3% কৃষকদের জমি রয়েছে 10 হেক্টারের বেশী। এই সব শুষ্ক এলাকায় মোট উৎপাদনের সঙ্গে ধান ও গমের উৎপাদন 30—40%, ভুট্টা, রাগী এবং তুলা 60—70%, বাজরা ও জোয়ার 80%, তৈলবীজ ও ডালশস্য 90% এবং ক্ষুদ্র দানাশস্য 100%। সুতরাং প্রোটিনের অভাব, খাওয়ার তেল এবং তুলার উৎপাদন উন্নত করতে শুষ্ক এলাকায় এইসব ফসলের চাষ করতে হবে।

6, 7, 12, 13, 14, 15, 16 প্রভৃতি সারণী থেকে ভারতের বিভিন্ন জায়গায় যেসব সম্ভাবনা পূর্ণ ফসল উৎপাদন করা যায়, তা উল্লেখ করা হয়েছে।

পরপৃষ্ঠার সারণী 17 ও 18 তে ভারতের বিভিন্ন শুষ্ক এলাকার কতকগুলি উপযুক্ত সাথী ফসল এবং উপযুক্ত শস্য পর্যায় পর্যালোচনা করা হ'ল।

সারণী 17 : বিভিন্ন শুষ্ক এলাকায় কতকগুলি উপযুক্ত সাথী ফসল (Some suitable intercrops)

এলাকা	পদ্ধতি (System)	মূল ফসলের ফলন (কু./হেক্টর)	সাথীফসল (কু./হেক্টর)
বিজাপুর	বাজরা	14·1	
	বাজরা/অড়হর	11·6	8·0
রাঁচী	ভুট্টা	28·6	
	ভুট্টা/অড়হর	28·2	6·2
আকোলা	জোয়ার	33·5	
	জোয়ার/ছোলা (সবুজ)	30·8	7·3
সোলাপুর	বাজরা	18·0	
	বাজরা/অড়হর	18·3	17·0
হায়দ্রাবাদ	জোয়ার	34·4	
	জোয়ার/অড়হর	33·5	5·5
রেওয়া	জোয়ার	25·4	
	জোয়ার/অড়হর	22·3	4·7
ইন্দোর	জোয়ার	32·7	
	জোয়ার/চীনাবাদাম	28·3	7·6
দেরাদুন	ভুট্টা	38·8	
	ভুট্টা/সয়াবীন	38·7	1·8

(Source : N. S. Randhawa and J. Venkateswarlu, 1979)

ভারতীয় শুষ্ক এলাকায় **মিশ্র ফসল**, সাথী ফসল এবং **এক ফসলী চাষ** দীর্ঘদিন থেকে চলে আসছে। এই পদ্ধতিতে প্রাকৃতিক প্রতিকূল অবস্থা (খরা/বন্যা প্রভৃতি), রোগ-পোকার উপদ্রব প্রভৃতির একটা ঝুঁকি রয়েছে। তবে একক ফসল চাষ অপেক্ষা মিশ্র সাথী ফসল চাষের সুবিধা হ'ল বিভিন্ন কৃষি উপাদানের ব্যবহার ও শ্রমিকের কর্মসংস্থান এতে বৃদ্ধি পায়। তবে মাটি সংরক্ষণ করে বৃষ্টির পরবর্তী সময়ে উপযুক্তভাবে সাথী বা মিশ্র শস্য চাষ করলে তা অধিকতর লাভজনক হয়।

সারণী 18 : বিভিন্ন শুষ্ক এলাকায় উপযুক্ত শস্য পর্যায় (Suitable crop sequences)

এলাকা	শস্য পর্যায় (crop sequence)	ঋতুর গড়	প্রথম শস্যের ফলন	দ্বিতীয় ফসলের ফলন
			(ফলন—কু./হেক্টার)	
সম্বা	জোয়ার-গম	3	21·5	24·0
	পতিত-গম	3		33·3
দেরাদুন	ভুট্টা-গম	4	38·5	31·8
	ধান-গম	4	43·1	29·9
	পতিত-গম	4		26·8
	ভুট্টা-ছোলা	4	30·3	16·2
বারাণসী	ধান-ছোলা	2	30·2	25·4
	পতিত-ছোলা	2		35·7
হোসিয়ারপুর	ভুট্টা-গম	7	27·3	27·2
	পতিত-গম	3		23·2
	ভুট্টা-ছোলা	7	27·3	15·3
	পতিত-ছোলা	3		17·0
বাঙ্গালোর	বরবটি-রাগী	5	8·6	27·6
	রাগী (একক)	4	26·9	
আকোলা	জোয়ার-সূর্যমুখী	3	45·4	14·1
আনন্দ	বরবটি-তামাক	2	8·2	9·7
বিজাপুর	সবুজ ছোলা-সূর্যমুখী	2	7·5	10·6
ইন্দোর	ভুট্টা-সূর্যমুখী	3	29·5	10·8
	জোয়ার-ছোলা	3	32·1	13·9
	ভুট্টা-ছোলা	3	35·5	14·3

(Source : N. S. Randhawa and J. Venkateswarlu, 1979)

এই পরিসংখ্যান থেকে স্পষ্টই বোঝা যায় যে, ভারতের এই সবশুষ্ক এলাকায় উপরোক্ত শস্য-পর্যায় অনুসরণ করলে ফসল উৎপাদনের প্রচুর সম্ভাবনা

রয়েছে এবং অধিকাংশ ডালশস্য ও তৈলবীজ শস্যের অতিরিক্ত উৎপাদন করার সুযোগ ও সম্ভাবনা রয়েছে।

মৃত্তিকা পরিচর্যা-জনিত বিভিন্ন গবেষণার ফলাফলের মধ্যে বিভিন্ন **কর্ষণ পদ্ধতি**, জলের ব্যবহার জনিত সমস্যা, যেমন—বৃষ্টির অতিরিক্ত গড়িয়ে যাওয়া জলের সংগ্রহ ও জমা করে তার পুনর্ব্যবহার, **মালচিং ব্যবস্থা** নিয়ে জল সংরক্ষণ করা, **বিনা কর্ষণে চাষ পদ্ধতি** (zero-till farming systems) প্রভৃতি নীচের সারণীগুলিতে আলোচনা করা হ'ল।

সারণী 19 : শস্যের ফলনের উপর বিভিন্ন কর্ষণ পদ্ধতির প্রভাব (effect of tillage practices) (কু./হেক্টার)।

এলাকা	শস্য	বছর	অগভীর কর্ষণ (Shallow) (দেশী লাঙ্গল)	গভীর কর্ষণ (Deep) (মোল্ড বোর্ড লাঙ্গল)
যোধপুর	বাজরা	1	8·5	10·8
দেরাদুন	ভুট্টা *	3	39·1	47·3
	গম	1	14·1	16·1
হোসিয়ারপুর	গম	1	6·3	12·9
	ভুট্টা	1	15·6	21·8
আগ্রা	বার্লি বা যব	2	14·9	17·3
বাঙ্গালোর	ভুট্টা	3	33·9	45·3
	অড়হর	1	3·8	9·6
	চীনাবাদাম	1	11·3	13·8
	রাগী	1	33·7	38·1
শোলাপুর	জোয়ার	1	28·9	29·7
অনন্তপুর **	রেড়ি	4	8·7	11·4
	অড়হর	4	8·4	11·5
	বাজরা	3	8·2	7·7
	চীনাবাদাম	4	7·9	9·9

* বৃষ্টির পরে কর্ষণ (post-rainy season tillage)

** প্রথম বছর কর্ষণ ও অবশিষ্ট প্রভাব তিন বছরের জন্য।

(Source : N. S. Randhawa and J. Venkateswarlu, 1979.)

এর থেকে দেখা যায় যে, গভীর কর্ষণে অনেক শস্যের ফলন বিভিন্ন এলাকায় বৃদ্ধি পায়। বেলারী ও শোলাপুরে ভারী কালো মাটিতে শুষ্ক বছর গুলিতে **খাড়া বা লম্বভাবে অবস্থিত মালচিং** (vertical mulching) এর সুফল খুব ভালভাবে পাওয়া গেছে (সারণী 20)।

সারণী 20 : বেলারীতে বাজরা ফসলের উপর খাড়া মালচিং-এর প্রভাব (effect of vertical mulching)

বিরতি (Interval)	শস্যের ফলন (কু./হে.)				
	1973	1974	1975	1976	1977
8 মিটার	2·8	16·1	17·1	11·2	19·2
4 মিটার	4·0	16·9	17·8	12·5	15·4
নিয়ন্ত্রিত (control)	0·2	11·2	11·0	10·8	14·5

মালচিং এবং বিনামালচিং-এর তুলনামূলক সুফল নীচের সারণী 21 থেকে স্পষ্ট হবে।

সারণী 21 : শস্য উৎপাদনে মালচিং-এর প্রভাব (কু./হে.)

এলাকা	শস্য	বছর	বিনামালচিং (control)	মালচিং
হোসিয়ারপুর	গম	2	28·6	35·1
দেরাদুন	গম	3	23·3	29·3
আনন্দ	তামাক	2	13·3	18·4
কোভিলপট্টি	জোয়ার	1	5·3	9·4
বেনারস	বার্লি	1	17·5	19·1
সোলাপুর	জোয়ার	1	9·8	16·4

শুষ্ক এলাকায় বিভিন্ন **কার্যকরী গবেষণা প্রকল্পে** (ORP) শস্যের নিবিড়তা বৃদ্ধির জন্য এইসব উপরোক্ত গবেষণার ফলাফল কৃষকদের কাছে সরাসরি আরো ব্যাপকভাবে সম্প্রসারণের ব্যবস্থা অবশ্যই কর্তব্য। তাই শুষ্ক তথা খরাপ্রবণ এলাকাতে নিম্নলিখিত বিষয়গুলির উপর অদূর ভবিষ্যতে **ব্যাপক গবেষণা** দরকার, যেমন—

(1) বৃষ্টির সময় বিভিন্ন প্রকার শুষ্ক এলাকার মাটিতে অতিরিক্ত গড়িয়ে যাওয়া জলের পরিচর্যা,

(2) প্রাকৃতিক সংস্থান সমূহের সর্বোত্তম ব্যবহার,

(3) তৈলবীজ ও ডালশস্যের উপযুক্ত জাত বাছাই করে ব্যাপক চাষ করা (একক বা মিশ্র/সাথী ফসল হিসাবে),

(4) জমির অবস্থান ভেদে সম্ভাব্য ব্যবহার,

(5) জৈব পদার্থের পুনঃচক্রবৎ ব্যবহার,

(6) সামাজিক-অর্থনৈতিক পর্যালোচনা,

(7) কৃষক তথা সম্প্রসারণ কর্মী এবং কৃষির সঙ্গে জড়িত অন্যান্য অপরিহার্য ব্যক্তিদের জন্য প্রশিক্ষণ।

নীচের চিত্র দুটিতে (চিত্র 29 ও 30) শুষ্ক এলাকার উন্নতি এবং প্রযুক্তি-বিদ্যা বা পদ্ধতি কৃষকদের কাছে কিভাবে পোঁছে দেওয়া যায়, তার একটা চিত্র তুলে ধরা হ'ল।
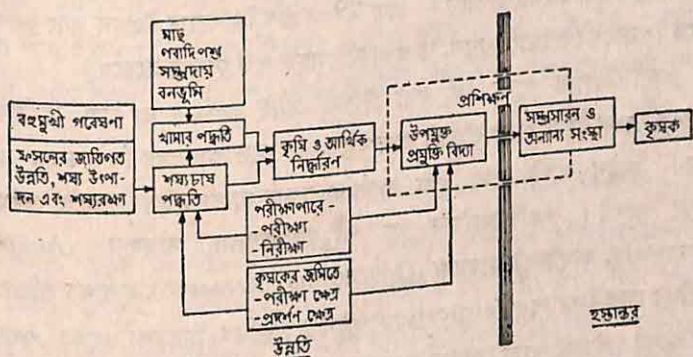
চিত্র 29 : প্রযুক্তি বিদ্যার উন্নতি ও হস্তান্তর পদ্ধতি।
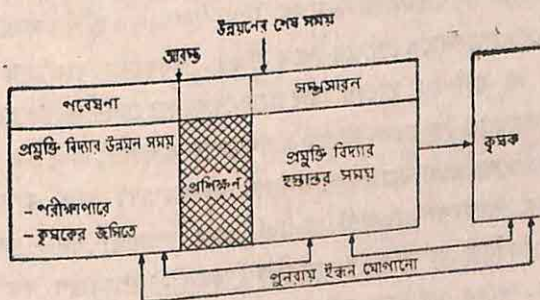
চিত্র 30 : প্রযুক্তি স্থানান্তরিতকরণের পদ্ধতি।

প্রযুক্তিবিদ্যার উন্নয়ন (Development of Technology) :

কৃষি প্রযুক্তিবিদ্যা তখনই যুক্তিযুক্ত বা সার্থক, যখন কৃষকরা এই উন্নত প্রযুক্তিবিদ্যাকে তাদের চাষবাসে সার্থকভাবে কাজে লাগাবে বা তা গ্রহণ করে কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি করবে। উন্নয়নশীল দেশে শুষ্ক চাষবাসের প্রযুক্তিবিদ্যা সাধারণতঃ ক্ষুদ্র এবং প্রান্তিক চাষীদের মাঝেই সম্প্রসারণ করতে হবে। কারণ মূলত এই শ্রেণীর কৃষকরাই এইসব সমস্যাবহুল এলাকায় বসবাস করে এবং তাদের জোতের পরিমাণও খুবই ক্ষুদ্র বা ছোট ছোট অংশে বিভক্ত। এখানে কৃষি উপাদানের সংস্থানও সীমিত। সুতরাং এইসব এলাকার জন্য সর্বদাই আমাদের তথা কৃষিবিজ্ঞানীদের এমন যুক্তিযুক্ত প্রযুক্তিবিদ্যা উদ্ভাবন করতে হবে, যাতে কৃষকদের স্বল্প আর্থিক ব্যয়ে এবং কম শক্তি খরচে এইসব ক্ষুদ্র কৃষকরা অনায়াসে কাজে লাগাতে পারে। চিত্র 29-এ প্রযুক্তিবিদ্যার উন্নয়ন এবং কৃষকদের কাছে কিভাবে পেঁছাতে হবে, তার একটি সহজ ছক দেওয়া হয়েছে।

প্রযুক্তিবিদ্যায় শুধু কি করা উচিত এটাই একমাত্র না বলে, তা কিভাবে সীমিত সংস্থানের মধ্যে কার্যকরী করা যাবে, তা ক্ষুদ্র কৃষকদের বিশদভাবে বলতে হবে। কারণ শুষ্ক তথা খরা প্রবণ এলাকায় মূলত এইসব শ্রেণীর কৃষকদের বাসই বেশী। **অভিযোজিত** বা **পরিবর্তনযোগ্য গবেষণা** (Adaptive Research), **কার্যকরী গবেষণা** (Operational Research), **যাথার্থ্য প্রতিপাদন পরীক্ষা ক্ষেত্র নির্মাণ** (Verification trials) প্রভৃতির সাহায্যে শুষ্ক এলাকার চাষবাসের প্রযুক্তিবিদ্যার ব্যাপক সম্প্রসারণ কর্তব্য।

প্রথমে কৃষকদের চিরাচরিৎ পদ্ধতি (Farmer's systems) গ্রহণ করে ছোট ছোট, সহজ সরল নতুন বিষয়ের সমাবেশ (innovations) ঘটিয়ে ফসলের উৎপাদন বৃদ্ধি কৃষকদের হাতেনাতে দেখিয়ে দিতে হবে। কৃষকদের ব্যর্থতার ফর্দ বেশী দীর্ঘ করে না দেখিয়ে তাদের ভাল করে বোঝাবার চেষ্টা করতে হবে যে এইসব ব্যর্থতার পিছনে কি কি কারণ রয়েছে। সব থেকে ফলদায়ী এবং কম খরচের নতুন বিষয়ের সমাবেশের মধ্যে উন্নতশীল ফসলের স্বল্পমেয়াদী জাত **বপনের তারিখ, গাছের ভাল সংস্থাপন** (good stand) এবং আগাছা দমন প্রভৃতি। এটা খুবই অন্তর্নিহিত ব্যাপার যে, গবেষক-বিজ্ঞানী, সম্প্রসারণ কর্মী এবং যারা আসল কৃষক, তাদের সবাইকে একত্রে এই উন্নত কৃষি প্রযুক্তিবিদ্যার উন্নতি ঘটাতে হবে। সবাই এখানে অপারিহার্য, একে অন্যের সম্পূরক। অথচ একজনকেও

বাদ দেওয়া যাবে না বা একক প্রচেষ্টায় কখনোই যে কোন প্রযুক্তিবিদ্যায় আসল বিকাশ সম্ভব নয়।

প্রযুক্তিবিদ্যার হস্তান্তর বা স্থানান্তরিতকরণ (Transfer of Technology) :

প্রযুক্তিবিদ্যা স্থানান্তরিত করণে দুটি অবস্থা আছে, **প্রথমতঃ** গবেষণাগার থেকে সম্প্রসারণ ক্ষেত্র (Research to extension) এবং **দ্বিতীয়তঃ** সম্প্রসারণ ক্ষেত্র থেকে আসল কৃষক (extension to farmer)। এর কারণ হ'ল, বেশীর ভাগ দেশেই গবেষণা ও সম্প্রসারণ সংস্থাগুলি পৃথক এবং স্বাধীন। গবেষণা বিভাগ থেকে কখনোই সরাসরি বৃহৎ সংখ্যক কৃষকদের সাহায্য করা যায় না বা সম্ভব নয়। তাই প্রযুক্তিবিদ্যা স্থানান্তরিত করণে প্রত্যেক অবস্থায় গবেষক, সম্প্রসারণ কর্মী এবং কৃষক সবাই ওতপ্রোত ভাবে জড়িত। প্রথম অবস্থায় কৃষকরা শুধুমাত্র দর্শক বা পর্যবেক্ষকের ভূমিকা গ্রহণ করে। দ্বিতীয় অবস্থায় গবেষণা পশ্চাদ্দিকে থাকে এবং প্রকল্পগুলির উপদেষ্টা হিসাবে কাজ করে (চিত্র 30)।

ধারাবাহিকতা বা নিরবচ্ছিন্নতা রক্ষণ (Maintaining continuity) :

গবেষণা নতুন জ্ঞানের উন্মেষ ঘটায়। এইসব জ্ঞানের যেগুলি দরকারী এবং সহজে ব্যবহার যোগ্য তাদের প্রযুক্তিবিদ্যায় মিশিয়ে দিতে হবে এবং যথাসময়ে তা সম্প্রসারণ কর্মীদের কাছে পেঁছে দিতে হবে। সম্প্রসারণ কর্মীরা আবার তা সহজভাবে সঙ্গে সঙ্গে কৃষকদের মাঝে পেঁছে দেবেন, সুতরাং এইভাবে একটা দীর্ঘসূত্রী প্রতিষ্ঠা সম্পর্কে ধারাবাহিকতা রক্ষা প্রয়োজন।

অষ্টম অধ্যায়

শুষ্ক ও খরাপ্রবণ এলাকায় ভূমি ও জল সংরক্ষণ ব্যবস্থা
(Soil and water Conservation in Rainfed Areas)

ভূমিকা :

সারা ভারতের 32 কোটি 80 লক্ষ হেক্টর জমির মধ্যে 15 কোটি হেক্টর বা প্রায় 45% জমি বৃষ্টি ও বায়ুর দ্বারা ক্ষয়ীভবনের সম্মুখীন। চাষযোগ্য 16 কোটি হেক্টর জমির মাত্র 8 কোটি 30 লক্ষ হেক্টর জমিতেই তাই ভূমি সংরক্ষণের প্রয়োজন। এই হিসাবে ভারতের ভূ-সম্পদের প্রায় এক চতুর্থাংশই ভূমি ক্ষয়ের দ্বারা পীড়িত।

মোটামুটি একটা হিসাব করে জানা গেছে, চাষযোগ্য জমি থেকেই প্রতি বছর প্রায় 600 কোটি টন মাটি ধুয়ে বেরিয়ে চলে যায়। যে কোন দেশের পক্ষে, বিশেষ করে আমাদের মত উন্নয়নশীল দেশের পক্ষে এই ক্ষতির ভয়ালরূপ খুবই উদ্বেগজনক।

ভারতবর্ষ ও অন্যান্য কয়েকটি দেশ ছাড়া আর কোথাও এত চাষযোগ্য জমি প্রায় নেই বললেই হয়। আমাদের দেশে ভৌগোলিক এলাকার প্রায় 48% জমি চাষ হয়। আমাদের এই স্বল্প ফলনের কারণগুলোর মধ্যে প্রধানতঃ ভূমিক্ষয়ের জন্য মাটির ক্রমাবনতি খরার মত প্রায়শ প্রাকৃতিক দুর্যোগ প্রভৃতি অন্যতম।

আমাদের রাজ্য **পশ্চিমবঙ্গের** ভৌগোলিক **এলাকা** 88 লক্ষ 61 হাজার হেক্টারের মধ্যে 55 লক্ষ 42 হাজার হেক্টার জমি চাষযোগ্য, অর্থাৎ মোট এলাকায় প্রায় 63% জমি চাষযোগ্য। প্রাথমিক হিসাবে ক্ষয় প্রাপ্ত জমির **পরিমাণ** ধরা হয়েছে 15 লক্ষ 60 হাজার হেক্টার। এর মধ্যে চাষযোগ্য ক্ষয়প্রাপ্ত জমির পরিমাণ প্রায় 12 লক্ষ হেক্টার।

এ রাজ্যে লাল ও কাঁকুরে এলাকা মোটামুটিভাবে পশ্চিমদিকেই বিস্তৃত। এই এলাকায় প্রধানতঃ ছোটনাগপুর মালভূমির বিস্তার। এই এলাকা প্রায় 15 লক্ষ হেক্টার। এর মধ্যে চাষ যোগ্য জমি প্রায় 6 লক্ষ 70 হাজার হেক্টার।

এই লাল কাঁকুরে এলাকা গড়ে প্রায় 200 মিটার উঁচু এবং উঁচু দাঁড়া ও নীচু অববাহিকা দ্বারা তৈরী। এই দুইপ্রকার জমির মধ্যে সমতার তফাৎ প্রায় 30—50 মিটার। সাধারণ গড় ঢাল (slope) 0--10%। বেশ কিছু জমির

ঢাল 10% এরও উপরে। মাঝে মধ্যে ছোট পাহাড়। টিলা আছে। এখানে ধাপে ধাপে আল বাঁধা ধানের জমি ছাড়া আর কোনও প্রকার সমতল জমি প্রায় নেই বললেই চলে। সাধারণতঃ পুরুলিয়া, বাঁকুড়া, মেদিনীপুর পশ্চিম (ঝাড়গ্রাম ও মেদিনীপুর সদর মহকুমা), বীরভূমের পশ্চিমাংশ এবং বর্ধমানের পশ্চিমাংশ প্রভৃতিতে এই প্রকার উঁচু-নীচু শুষ্ক এলাকা ও লাল-কাঁকুরে মাটি দেখা যায়। কয়েকটি নদীর সাহায্যে এইসব এলাকায় জল নিষ্কাশন হয়। এই সঙ্গে এইসব নদী দিয়ে প্রচুর পরিমাণে পলিমাটি ধুয়ে চলে যায়।

উঁচু জমির জলধারণ ক্ষমতা খুবই কম এবং মাটি পাথুরে বা নুড়িযুক্ত। এর ফলে বৃষ্টিকালে পশ্চিমবঙ্গের এইসব জেলায় পরিমাণ মত বৃষ্টি হওয়া সত্ত্বেও (গড় বার্ষিক বৃষ্টিপাত 1300—1500 মিমি) এইসব জমিগুলি প্রায় সব সময়ই খরার কবলে থেকে যায়। নীচের জমিগুলির ("বহাল" বা "শোল") জল-নিষ্কাশন ব্যবস্থা ভাল হয় না। ফলে সেখানে ধান ছাড়া অন্য কোন ফসলের চাষ প্রায়ই হয় না বললে চলে।

এই লাল কাঁকুরে মাটির এলাকা নাতিশীতোষ্ণ মণ্ডলের অন্তর্গত। এখানে গড় তাপমাত্রা গ্রীষ্মকালে 36·60° সে. এবং শীতকালে 8—10° সে.। এই এলাকার গড় বার্ষিক বৃষ্টিপাত সারা পশ্চিমবঙ্গের মধ্যে কম। পুরুলিয়া জেলার গড় বার্ষিক বৃষ্টিপাত তার মধ্যে আবার সব থেকে কম, যেমন— পুরুলিয়ায় 1300, বাঁকুড়ায় 1421, বীরভূমে 1422, মেদিনীপুরে 1560, বর্ধমানে 1529 মি. মি.। পুরুলিয়া, বাঁকুড়া, প্রভৃতি জেলায় অধুনা বন অরণ্য নতুন করে না বাড়িয়ে কিছু অবুঝ স্থানীয় অধিবাসী তা কেটে জীবিকা নির্বাহ করায়, এসব এলাকায় আগের থেকে বৃষ্টিপাতের পরিমাণ ক্রমশ কমে যাচ্ছে এবং চাষবাসে জেলার উৎপাদন আরো কমে যাচ্ছে। 1950 সাল পর্যন্ত পুরুলিয়া জেলার বার্ষিক গড় বৃষ্টিপাত ছিল 1350 মিমি। কিন্তু এখন 1959 থেকে 1978 সাল পর্যন্ত এই 20 বছরের গড় বার্ষিক বৃষ্টিপাত মাত্র 1313 মিমি।

যে সব এলাকায় শতকরা 20 ভাগ সম্ভাবনা থাকে এবং গড় বৃষ্টিপাত 25% এরও কম বৃষ্টিপাত হয়, সেসব এলাকাকে **খরা প্রবণ এলাকা** (Drought prone areas) বলে। সেই হিসাবে এইসব লাল কাঁকুরে মাটির এলাকার প্রায় সবটাই খরা প্রবণ এলাকা। উদাহরণস্বরূপ, পুরুলিয়া জেলার গড়

বৃষ্টিপাতের (1350 মিমি) শতকরা 25 ভাগ কম বৃষ্টিপাত হ'ল 337·50 মিমি। অর্থাৎ যে সব বছরে 1012·50 মিমির (1350 মিমি—337·50 মি. মি.=1012·50 মিমি) কম বা তার কাছাকাছি বৃষ্টিপাত হয়েছে, সেগুলিকে **খরার বৎসর** বলে ধরা যায়। এই হিসাবে 1959 থেকে 1982 সালের মধ্যে 24 বছরের গড়ে প্রায় প্রতি তৃতীয় বছরে 8 বার খরা হয়েছে 1962, 1963, 1966, 1972, 1976, 1979, 1981 এবং 1682)।

পশ্চিমবঙ্গে ভূমিক্ষয়ের কারণসমূহ :

ভূমিক্ষয়ের বিভিন্ন কারণগুলির মধ্যে **বৃষ্টিপাতই** প্রধান। ঝড়বৃষ্টির প্রকৃতি, তার পরিমাণ, তীব্রতা স্থিতিকাল প্রভৃতি ভূমিক্ষয়ের কাছে মূলভূমিকা গ্রহণ করে। বৃষ্টিপাতের তীব্রতা যত বেশী হবে, বৃষ্টি ধারার মধ্যে তত বেশী গতি শক্তি থাকবে। এই গতিশক্তিই মাটির কণাগুলিকে আলগা করে স্থানচ্যুত করে। আবরণহীন ভু-তলের উপর এই গতি-শক্তি অনেকটা বোমা বিস্ফোরণের কাজ করে। এইসব স্থানচ্যুত মাটির অজস্রকণা জলের সঙ্গে গড়িয়ে মাঠের বাইরে চলে যায়। বৃষ্টির স্থিতিকাল যদি বেশী হয়, জমির জল শোষণ ক্ষমতা কমে যায় এবং অতিরিক্ত জল জমির উপর দিয়ে নীচের ঢালু জমির দিকে গড়িয়ে চলে যায় এতে ভূমিক্ষয় বৃদ্ধি পায় এবং এই অতিরিক্ত জল বৃথা নষ্ট হয়। অথচ আগেই আলোচনা করা হয়েছে, এই অতিরিক্ত গড়িয়ে যাওয়া জল ছোট ছোট জলাধারে (পুকুর প্রভৃতি) জমা রাখার ব্যবস্থা করলে গ্রীষ্মকালে রবি মরসুমে তা দিয়ে সহজেই ডাল শস্য / তৈলবীজ শস্য / সবজি প্রভৃতির চাষ সম্ভব। একেই "**water harvesting**" বলে।

ভূমিক্ষয়ের **অন্যান্য কারণের মধ্যে জমির ঢাল** আর একটি প্রধান কারণ। ঢাল যত বেশী হবে, জলের গতিও তত বৃদ্ধি পাবে। সাধারণভাবে বলা হয়, ঢাল যদি চারগুণ বেশী হয়, তাহলে গড়ানো জলের গতি দ্বিগুণ বাড়বে এবং এর শক্তি বাড়বে চারগুণ। অর্থাৎ এককথায়, ভূমিক্ষয়ের ক্ষমতা চারগুণ বৃদ্ধি পাবে।

এইসব অঞ্চলের **মাটি হাল্কা**। অথচ কিছু নীচেই কাদার অংশ বেশী থাকার ফলে বৃষ্টির জল বেশী ভেতরে প্রবেশ করতে পারে না। এবং বেশীর ভাগ জলই তাই গড়িয়ে বের হয়ে যায় ও ভূমিক্ষয় বৃদ্ধি পায়।

এছাড়া **ভূ-পৃষ্ঠের উদ্ভিদ আবরণের চরিত্রের উপরও** ভূমিক্ষয় নির্ভর করে। **ঘন উদ্ভিদ আবরণ** থাকলে বৃষ্টির জলের ফোঁটায় মাটিতে বেশী আঘাত করার

ক্ষমতা হ্রাস পায়। এই আঘাত উদ্ভিদ গ্রহণ করার ফলে ভূমিক্ষয় প্রায় হয় না বললে চলে। উদ্ভিদের আবরণ মাটিকে জল শুষে নেওয়ার ক্ষমতা বাড়ায়। এর ফলে গড়ানো জলের পরিমাণও কমে।

সাধারণতঃ প্রকৃতিতে জীব ও উদ্ভিদ সর্বদা একটা **ভারসাম্য** (Natural equilibrium) বজায় রাখতে চেষ্টা করে। এই ভারসাম্য বিশেষ করে উচ্চ পর্যায়ের জীব বা উদ্ভিদের অবস্থানের পক্ষে সহায়ক হয়। প্রকৃতিতে উদ্ভিদের জাত বা প্রজাতির আবির্ভাব ঘটে। এই উন্নত জাত বা প্রজাতি ক্রমশ এক সময়ে শীর্ষস্থান অধিকার করে বেশী সংখ্যায় অবস্থান করে। যদি কোন কারণে এই প্রাকৃতিক অবস্থার সমতা বিঘ্ন ঘটানো হয়, তবে উন্নত জাতি বা প্রজাতির ক্রমশ অবলুপ্তি ঘটে ও নীচু মানের প্রজাতিরা সংখ্যায় বৃদ্ধি পেয়ে তাদের প্রভাব বিস্তার করে। এতে আমাদের প্রাকৃতিক সম্পদ ক্রমশ সংকুচিত হয়।

উদাহরণস্বরূপ উল্লেখযোগ্য যে, এইসব এলাকায় (বিশেষ করে পুরুলিয়া, বাঁকুড়া, মেদিনীপুরের পশ্চিম জেলা প্রভৃতি এলাকায়) এক সময় উন্নত দীর্ঘকায় শালগাছ ছিল। তার নীচে ছিল মহুয়া, পলাশ প্রভৃতি গাছ। শালগাছ অবিবেচকের মত স্থানীয় অধিবাসীরা ক্রমাগত কেটে ফেলার পর এখন আরও নীচু স্তরের গাছ, যথা পলাশই বেশীর ভাগ জায়গা দখল করে আছে। প্রাকৃতিক এই অবক্ষয়ের ফলে এখন শাল গাছের বনসৃজন তাই খুবই কষ্টসাধ্য। তাই বেশীর ভাগ জায়গায় এই প্রচেষ্টা বিফলে গেছে। একসময় এইসব এলাকায় 'সাইমা', 'ডাইক্যান্থিয়াম' প্রভৃতি জাতের উন্নত ঘাসের প্রাধান্য ছিল। কিন্তু ক্রমশ গরু, ছাগল, ভেড়ার সংখ্যা বৃদ্ধির ফলে অতিরিক্ত গোচারণ ঘটেছে। এখন এই ঘাস আর প্রায় দেখা যায় না। এর বদলে 'এরিষ্টিভা' বা চোরকাঁটা জাতীয় নিকৃষ্ট জাতের ঘাসের প্রাধান্য বেশী দেখা যায়। অথচ এই সাইমা, ডাইক্যান্থিয়াম প্রভৃতি জাতের ঘাস গো-খাদ্যের পক্ষে খুবই ভাল। চোরকাঁটা বা 'এরিষ্টিভা' জাতের ঘাস গোখাদ্যের পক্ষে খুবই নিম্নমানের। তাই **প্রকৃতির উপর মানুষের অবিমৃস্ব ব্যবহার ভু-সম্পদ ক্ষয়ের সব থেকে একটি মস্ত বড় কারণ।**

এইসব লাল ও কাঁকুরে মাটি যুক্ত এলাকায় ভূমিক্ষয় খুবই সক্রিয়। আল-বাঁধা ধানের জমি ছাড়া অন্য সব জমিতেই নানা অবস্থায় ভূমিক্ষয় অগ্রসর হয়ে চলেছে। প্রতি বছর **একটি পূর্ণ** চাষ পদ্ধতি অচিন্তনীয় **বেআইনী বনচ্ছেদ,**

ভূমি সংরক্ষণের পদ্ধতির ব্যাপক প্রয়োগের অভাব এই ভূমিক্ষয়কে ক্রমশ বাড়িয়ে চলেছে। এইসব এলাকায় সকল প্রকারের ভূমিক্ষয়ই প্রচুর পরিমাণে দেখা যায়, যেমন—ভূমিতলক্ষয়, ছোট ও বড় দাঁড়া জলের স্রোতে তৈরী হওয়া **গভীর খাদ** (gully); **দরিখাদ** কমবেশী সব অবস্থায় দেখা যায়।

ভারতবর্ষে প্রতি বছর প্রায় 600 কোটি টন মাটি ধুয়ে চলে যায়। এই মাটির সঙ্গে 25 লক্ষ টন নাইট্রোজেন, 28 লক্ষ টন ফসফরাস এবং 33 লক্ষ টন পটাশ উদ্ভিদ খাদ্য উপাদানও ধুয়ে বেরিয়ে যাচ্ছে। প্রতি টন উদ্ভিদ খাদ্যের দাম যদি 5,000 টাকা ধরা হয়, তাহলে বছরে প্রায় 4300 কোটি টাকার উদ্ভিদ খাদ্য বরবাদ হয়। সুতরাং ভূমিক্ষয়ের ফলে কি ভয়াবহ ভূসম্পদ নষ্ট হয়, এর থেকে তা সহজেই অনুমেয়।

পশ্চিমবঙ্গের এইসব খরা প্রবণ এলাকায় কয়েকটি নদী দিয়ে যে পরিমাণ মাটি ধুয়ে বেরিয়ে চলে যায়, তার একটি সামান্য হিসাব দেওয়া হল।

সারণী—22 : নদীবাহিত ভূমিক্ষয়ের পরিমাণ।

ক্রমিক নং (1)	নদীর নাম (2)	যে স্থানে পরিমাপ করা হয়েছে (3)	প্রতি এক বর্গমাইল* অববাহিকায় যত মাটি ক্ষয় হয়, তা একর ফুট হিসাবে জমার পরিমাণ (4)	বছর (5)
1	দামোদর	পাঞ্চেৎ জলাধার	2·24	1972
2	কংসাবতী	খাড়রা জলাধার	1·86	1971
3	ময়ূরাক্ষী	ম্যাসাঞ্জোর জলাধার	4·21	1974
4	দ্বারকেশ্বর	বাঁকুড়া	1·54	1948

দ্রষ্টব্য : * প্রতি বর্গমাইল অববাহিকা থেকে যে পরিমাণ মাটি প্রতি বছর ধুয়ে চলে যায়, তা যদি এক বছর জমির উপর জমানো যায়, তবে 4নং স্তম্ভে যে সংখ্যা দেখানো আছে, তা 30 ফুট উচ্চ হবে।

মনে রাখা ভালো যে, ১ একর ফুট মাটির ওজন প্রায় 2000 টন এবং এই মাটি বেশীর ভাগই আসে জমির উপরের উর্বর অংশ ক্ষয় হয়ে। এর প্রতি 1000 টন মাটিতে থাকে নাইট্রোজেন 125 কেজি, ফসফেট 35 কেজি এবং পটাশ

125 কেজি। এর থেকে মোটামুটি ভূমিক্ষয়ের ও তার সঙ্গে জমির উর্বরতা শক্তি ক্ষয়ের বাৎসরিক পরিমাণ কতটা, তার একটা ধারণা করা যাবে। এই ক্ষয় বছরের পর বছর বিনা বাধায় হয়ে চলেছে। যে সমস্ত জমি থেকে এই ক্ষয় হয়, সেখানে এতটা নজর আসে না এবং সাধারণ লোকও এই সাংঘাতিক ক্ষয় সম্পর্কে বিশেষ ওয়াকিবহাল নয়। অথচ এই করাল ভূমি ক্ষয় আমাদের জমিগুলিকে বন্ধ্যা করে দিচ্ছে।

এইসব ভূমি ক্ষয়ের ফল সুদূর হতে পারে। বর্ধিত ভূমি ক্ষয়ের অস্বাভাবিক পরিমাণ মাটির কণা গড়ানো জলের সঙ্গে জমি থেকে বাহিত হয়ে স্থানান্তরিত হয়। ভারী ও মোটা কণাগুলি বিশেষ করে কাঁকর বালি কাছের নীচু জমিতে জমা হয়। ফলে ঐ জমিটাও নষ্ট হয়। ছোট ছোট পলি ও কাদা কণা জলের সঙ্গে ভেসে যেতে থাকে। যেখানে জলের স্রোত আটকা পড়ে, সেইখানেই এই কণাগুলি নীচে জমতে থাকে। সুতরাং যে সব জমি থেকে এই মাটি ধুয়ে নেমে আসছে, সেই জমি গুলিকেই শুধু নষ্ট করে না, যে সমস্ত জল-নিকাশি নালা, জোড়বাঁধ, নদী ইত্যাদি আছে সেই গুলিকেও ভরাট করে দেয়। এর ফলে স্থানীয় বন্যার প্রকোপ বৃদ্ধি পায়। এই মাটির কণাগুলি বহুমূল্য জলাধার গুলিতে জমে তাদের জীবনকাল সংকুচিত করছে। এই বহুমুখী প্রকল্প গুলির জীবনকাল সংকুচিত হলে এই হিতকর প্রকল্পগুলির কার্যকারিতা অনেক কমে যায়। এর ফলে যে পরিমাণ অর্থ এই গুলির জন্য ব্যয় হয়, তার উপকারিতাও কমে যায়। সেচের ক্ষমতা ও জলবিদ্যুৎ উৎপাদনের হার কমে যাওয়ার ফলে জাতীয় অর্থনীতির উপর প্রচণ্ড চাপ পড়ে। ফলে কৃষি উৎপাদন কমে যায় এবং শিল্পের প্রভূত ক্ষতি হয়। এছাড়া জলাধারে জলধারণের ক্ষমতা কমে যাওয়ায় নীচের দিকে আবার বন্যা ও পলিমাটি জমার সংকট বৃদ্ধি পায়।

স্বাধীনতার অব্যবহিত পরেই এই সমস্যা পর্যবেক্ষণ ও প্রতিকারের উপায় নির্দেশ করার জন্য 1949 সালে তখনকার অবিভক্ত বাংলা সরকার **ডাঃ জে. কে. বসুর** উপর এ-বিষয়ের ভার দেন। ডাঃ বসু তার প্রতিবেদনে যে সব সমস্যা ও প্রতিকারের উপায় বলেছিলেন ; তা আজও প্রায় সবগুলিই এক্ষেত্রে প্রযোজ্য।

প্রতিকার ব্যবস্থা ঃ পশ্চিমবঙ্গে এই সব খরা প্রবণ জেলার ভয়াল ভূমিক্ষয় ও তার প্রতিকারের জন্য সংক্ষেপে নিম্নরূপ ব্যবস্থা নেওয়া দরকার।

(1) বীরভূম, বাঁকুড়া ও মেদিনীপুরের (পশ্চিম) যে সমস্ত জমি ভূমিক্ষয়ের

ফলে চাষের অযোগ্য হয়ে গেছে, সেগুলির উন্নতির জন্য নতুন করে বনসৃজন করা আশু কর্তব্য।

(2) **অনুচিত পদ্ধতিতে চাষ ও অন্যান্য ফসলের চাষ** (যেমন, ঢালের দিকে জমির দৈর্ঘ্য রাখা ও ঢাল বরাবর চাষ কার্য চালানো): যে সব শস্য অনেক ফাঁক দিয়ে লাগান হয়, তার সংরক্ষণ বন্দোবস্ত ছাড়া সেইসব শস্যের বেশী চাষ, যেমন—ভুট্টা, জোয়ার প্রভৃতি চাষ করার ফলে ভূমিক্ষয় হয়ে যে সব চাষ যোগ্য জমি চাষের বাইরে চলে গেছে, সেগুলিকে গোখাদ্য জাতীয় ঘাসের জমিতে পরিণত করা দরকার।

(3) ডাঙ্গা বা টাঁড় পাথুরে জমি চাষের জন্য বিশেষ ব্যবস্থা নিতে হবে, যেমন—যথাযোগ্য শস্যের চাষ, জমিতে যথোপযুক্ত জল দিয়ে গড়িয়ে যাওয়া জলের গতি আটকানো ইত্যাদি করতে হবে।

(4) শুষ্ক জমিতে চাষ—খরাসহনশীল শস্য চাষের প্রযুক্তিবিদ্যা অবলম্বন করে উপযুক্ত স্বল্প-মেয়াদী জাত বাছাই ও সম্ভাবনাময় সংকর জাতের শস্যের উদ্ভাবন, বিভিন্ন জাতের চাষ পদ্ধতির পরীক্ষা নিরীক্ষা চালাতে হবে।

(5) বালি ভরাট জমির উদ্ধার। উচ্চবন্যার দ্বারা বা চরের জমি বালি পড়ে ভরাট হয়ে ভাল চাষের জমি অকেজো হয়ে যায়। এর থেকে ক্ষতিগ্রস্ত জমিকে উদ্ধার করতে হবে।

(6) যে সমস্ত জমি প্রায়ই বন্যার কবলে পড়ে, তাদের রক্ষা করতে হবে।

(7) যে সব জমি লবণাক্ত, ক্ষারযুক্ত ও সমুদ্রের কবলে পড়ে, তাদের রক্ষা করতে হবে।

ভারত সরকার ভূমিসংরক্ষণ ও ভূমি ব্যবস্থার সংস্থা (Soil conservation and Land use Organization) সারা ভারতবর্ষকে 10টি ভাগে ভাগ করে সেইসব জায়গার সমস্যাগুলিকে চিহ্নিত করেছে। আমাদের রাজ্য পশ্চিমবঙ্গের মধ্যে এই দশটি ভাগের চারটি ভাগ পড়েছে। তার মধ্যে পশ্চিমবঙ্গের পশ্চিমাঞ্চল অন্যতম। এই পশ্চিমবঙ্গের যে সব সমস্যা চিহ্নিত করা হয়েছে, সেগুলি নিম্নরূপ—

(1) অঞ্চলের ক্রমিক সংখ্যা—8

(2) ভূমি সংরক্ষণ অঞ্চল—ভারতের পূর্ব দিকের লাল মাটির অঞ্চল।

(3) বৃষ্টিপাত: 1000-1500 মিমি।

(4) **সমস্যাবলী ঃ** সমতলে ক্ষয়ীভবন (Sheet erosion), দরিক্ষয় (gully erosion), তীব্র জলাভাব, পুনঃ পুনঃ খরা, বেশী গোচারণ, ভ্রান্তিমূলক জমির চাষের ব্যবস্থা ও জমির ব্যবহার, জলাধারগুলিতে পলি জমা পড়া, প্রভৃতি।

ভূমি ও জলসংরক্ষণের ব্যবস্থাবলী ঃ

মাটি ও জল এই দুটিই প্রকৃতির সব থেকে বেশী গুরুত্বপূর্ণ সম্পদ। এরাই গ্রামীণ অর্থনীতির উপর সব থেকে বেশী প্রভাব বিস্তার করে রয়েছে। এই দুই সম্পদের তাই সুষ্ঠু ও বৈজ্ঞানিক ব্যবহার গ্রামীণ অর্থনীতির সম্যক উন্নতি ঘটাতে পারে।

ভারতের জাতীয় কৃষি কমিশন (1975) সুপারিশ করেছেন যে, জমির নিবিড় সদ্ব্যবহার জমিকে অবক্ষয় থেকে রক্ষা করে। বহুবিস্তৃত উৎপাদনমূলক নিয়োগ ব্যবস্থা ও বৈষম্যের সমতা আনাই ভূমিনীতি হওয়া উচিত।

সারাদেশে মাত্র 25—30% সেচ ব্যবস্থা এ পর্যন্ত করা গেছে। বাকী 70—75% জমিই বৃষ্টি-নির্ভর চাষবাসের আওতাধীন, একথা আগেই অনেকবার উল্লেখ করা হয়েছে। এইখানেই সুষ্ঠু ভূমি ও জল সংরক্ষণের বিরাট ভূমিকা রয়ে গেছে। এই ব্যবস্থা গ্রামের বিস্তৃত এলাকায় ফসলের উৎপাদন বৃদ্ধিরই শুধু সহায়তা করবে না, উপযুক্ত এলাকায় গোখাদ্য ও বন সৃজনের সহায়তা করে গ্রামীণ অর্থনৈতিক উন্নতিরও সহায়ক হবে। বর্তমানে ভূমি সংরক্ষণের সংজ্ঞা দ্বারা জমির সঠিক ব্যবহার সবরকম ক্ষয়ক্ষতির হাত থেকে জমিকে রক্ষা করা, জমিতে জল সংরক্ষণ (বিশেষ করে গ্রীষ্মকালের জন্য বা রবিমরসুমের জন্য), উর্বরতা গঠন ও ফলনের উন্নতি প্রভৃতিকে বোঝায়। সুতরাং জমিকে উৎপাদনশীল রাখতে হলে সেখানে উপযুক্ত ভূমি সংরক্ষণের জন্য সব রকমের ব্যবস্থাই প্রবর্তন করা দরকার। এই প্রয়াসে জমির যোগ্যতা অনুসারে সংরক্ষণ প্রণালী ব্যবহার করা দরকার। এই কারণেই যে প্রকার জমিতে যে প্রণালী ব্যবহার করলে সুষ্ঠু ফল পাওয়া যাবে, তার অধ্যয়ন করা অবশ্যই কর্তব্য।

ভূমি ও জল সংরক্ষণের বিভিন্ন প্রণালী রয়েছে। কোন জায়গায় এর প্রয়োগ এককভাবে, আবার কোন জায়গায় সমষ্টিগতভাবে প্রয়োগ করতে হয়। প্রায় বেশীর ভাগ জায়গায়ই এদের সমন্বয়ের পূর্ণ ব্যবহার করা উচিত। এতে একটি পদ্ধতি বা প্রণালী অন্য পদ্ধতির পরিপূরক ও সাহায্যকারী হবে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, পুরুলিয়া জেলায় সাধারণতঃ উপরের টাঁড় জমিতে সমতল বাঁধ

নির্মাণ করা হয়। তারপরই যেখানে টাঁড়ের সীমানায় জমির ঢাল কিছু বেশী হয়, সেখানে দরি (gully) ক্ষয় সৃষ্টি হয়। এ গুলিতে ছোট ছোট জল **সংরক্ষণ বাঁধ** (storage structure) ও বাঁধের ঠিক নীচের জমিকে ধাপ করে ধানের জমির মত করে (Bench Terracing) সংরক্ষণ করার রীতি প্রচলিত আছে। এর ফলে প্রতিটি প্রণালী একে অপরকে সাহায্য করছে। সমতল বাঁধ উপরে থাকার ফলে নীচের জল সংরক্ষণের বাঁধে পলি মাটি জমবে না এবং হঠাৎ বেশী বৃষ্টি হলেও জলের তোড়ে **জল সংরক্ষণ বাঁধ** ভেঙ্গে যাবে না। আবার এখানে জল সংরক্ষিত হলে নীচের জমি সরস থাকবে, অথবা জল সেচের বন্দোবস্ত করা যাবে।

বর্তমানে ভূমি সংরক্ষণের কাজে নদীর বড় অববাহিকাকে ভূ-প্রকৃতি অনুযায়ী ছোট করে নিয়ে সেই ছোট এলাকাকে কম সময়ের মধ্যে সংরক্ষণের বিভিন্ন প্রণালী দিয়ে সম্পৃক্ত করার পদ্ধতিকে সুপারিশ করা হয়। এর ফলে অন্তত ঐ ছোট এলাকাটি ভূমি ও জল সংরক্ষণের পরিপূর্ণ আওতায় আসে ও তার ফল শীঘ্র পাওয়া যায়।

জল ও ভূমি সংরক্ষণের জন্য যেসব বিভিন্ন প্রণালীর প্রয়োগ-সুপারিশ করা হয়, তা প্রয়োগ করতে হলে ঐ সব এলাকার কতকগুলি পরিসংখ্যানের প্রয়োজন হয়। যেমন, ভূ-প্রকৃতির অবস্থা, বৃষ্টিপাত ও বারি বিজ্ঞান, ভূমি ও উদ্ভিদ আবরণ, ঢালের পরিমাণ প্রভৃতি জেনে নিয়ে সেইগুলি দিয়ে ঐ এলাকার বিভিন্ন মানচিত্র তৈরী করে যে সমস্ত স্থান ভূমিক্ষয়ের সবথেকে বেশী প্রভাবের মধ্যে রয়েছে, সেই জায়গাগুলি আগে বেছে নিয়ে সার্ভের কাজ সুরু করতে হয়। এই সব অবস্থা জ্ঞাত হওয়ার পর ভূমি সংরক্ষণের পদ্ধতিগুলির যথোপযুক্ত প্রয়োগ সম্ভব হয়।

ভূমি ও জল সংরক্ষণগুলিকে সাধারণতঃ তিনটি শ্রেণীতে ভাগ করা হয়, যথা—

(1) **চাষ আবাদের পদ্ধতি** (Agronomic Measures)—যেখানে জমির ঢাল কম, সেখানে চাষ আবাদের সংরক্ষণ পদ্ধতি প্রয়োগ করে ভূমিক্ষয় রোধ করা সম্ভব।

(2) **ভূমি সংরক্ষণকারী ফসলের চাষ**—যেমন, শুঁটি জাতীয় ফসল প্রভৃতি যে সব গাছ খুব তাড়াতাড়ি বৃদ্ধি পায় ও মাটির উপর একটা আবরণ সৃষ্টি করে, তারা ভাল সংরক্ষণকারী ফসল।

(3) **ঢালের আড়াআড়ি চাষ**—লাঙ্গল দেবার সময় অন্তত যেন শেষ চাষ ঢালের আড়াআড়ি দেওয়া হয়। এতে করে লাঙ্গলের ফলায় যে সব ছোট ছোট দাঁড়ার সৃষ্টি হয়, সে গুলো জলের স্রোতকে ধাক্কা দেয়। এর ফলে স্রোতের তীব্রতা বা গতি কমে যায় ও ভূমিক্ষয় অপেক্ষাকৃত কম হয়।

ফসলের চাষ সারিতে করার সময় যদি সেই লাইন ঢালের আড়াআড়ি রাখা হয়, তাহলেও প্রায় একই ফল পাওয়া যাবে।

(4) **সারিতে চাষ ও পর্যায়ক্রমিক চাষ**—ঢালের আড়াআড়ি কয়েক লাইন সংরক্ষণকারী ফসল ও কয়েক লাইন অন্য ফসলের চাষ (যেমন—ভুট্টা)।

(5) বাস্তুবিদ্যা পদ্ধতি (Engineering Process)—অনেকগুলি যান্ত্রিক ইঞ্জিনিয়ারিং পদ্ধতির সাহায্যে ভূমি ও জল সংরক্ষণ করা যায়, যেমন—

(ক) ঢালু জমিতে **সমতল** বাঁধ নির্মাণ (contour bunding) বা ঢালের আড়াআড়ি বাঁধ দেওয়া।

(খ) জমিকে ধাপে ধাপে সমতল করা (Bench terracing)।

(গ) খাদ বা নালীক্ষয় রোধ করার জন্য ছোট জলাধার নির্মাণ।

(ঘ) অন্যান্য প্রণালী, যেমন—ঢালুর নীচে ছোট ছোট এলাকায় যেখানে মাটিতে রস আছে, সেখানে **'খুদীপ' করে চাষ** (listing cultivation), **'রিং' পদ্ধতিতে ফসলের চাষ** (Ring cultivation), প্রভৃতি।

এই সব পদ্ধতির প্রত্যেকটিই জমির গড়ানো জল যাতে তীব্রবেগ ধারণ করতে না পারে ও জমির ঢালের পরিমাণ এবং ভূমিক্ষয়ের পরিমাণ কম রাখে তার উপর নজর রেখে প্রয়োগ করা কর্তব্য।

(6) **উদ্ভিদ প্রণালী**—এই পদ্ধতিতে ঘাস, গাছপালা প্রভৃতি জমির উপর লাগিয়ে আবরণ সৃষ্টি করা হয়। এইসব ঘাস ও গাছপালা অর্থকরীও হয়।

(7) **বনসৃজন** (Afforestation)—যে সব জমিতে ফসলের চাষাবাদ সম্ভব নয়, সেখানে বন সৃজন করে সংরক্ষণ কার্য করা কর্তব্য।

(8) **ঘাসের জমি উন্নয়ন** (Development of Pasture land)

অনেক জমি আছে, যেখানে কোনও প্রকার ফসল চাষ সম্ভব নয়। অথচ এইসব জমিতে গো-খাদ্য বা বাবুই ঘাস চাষ করা সম্ভব। তাই এরূপ জমিতে বনভূমি সৃজনের পরিবর্তে ঘাসচাষ করার উন্নয়নের দিকে বিশেষ নজর দেওয়া কর্তব্য। বাবুই একটি অর্থকরী ঘাস। এর থেকে শক্ত দড়ি তৈরী হয় এবং তা অনেক কাজে প্রয়োজন হয়।

নবম অধ্যায়

বিভিন্ন তথ্যাবলী

(1) শুষ্ক এলাকায় উৎপন্ন বিভিন্ন শস্যের উদ্ভিদ বিদ্যাগত বৈজ্ঞানিক নাম (**Botanical names of semidryland crops**) :

শস্য (crops)	বৈজ্ঞানিক নাম (Botanical names)
অড়হর (Redgram/Pegeonpea/arhar/tur) :	*Cajanas cajan* Millop. *C. indicus* Sprengl.
বাজরা (Pearlmiller) :	*Fennisetum typhoides* (Burm.f.) Stapt. and *CE* Hubb.
বার্লি বা যব (Barley) :	*Hordeum vulgare* L.
ছোলা (Gram/Bengal gram/chickpea) :	*Cicer arietinum* L.
রেড়ি (Castor) :	*Ricinus communis* L.
লঙ্কা (Chillies) :	*Capsicum annuum* L.
গুয়ার (Cluster bean) :	*Cyamopsis tetragonaloba* (L) Taub.
ব্লু প্যানিক (Blue Panic) :	*Panicum antidotale* (L). Retz.
ধনিয়া বা ধনে (Coriander) :	*Coriandrum sativum* L.
বরবটি (Cowpea) :	*Vigna aconitifolia* (jacq.) Marechall.
মথবীণ (Dewgram/Moth) :	*Vigna aconitifolia* (jacq.) Marechall.
রাগী (Finger millet/Ragi) :	*Eleusine coracana* (L.) Gaertn.
সিটেরিয়া, ইটালিয়াম সিলেট (Foxtailmillet/Setaria/Itallian/millet) :	*Setaries italica* (L). Beauv.
তিল (Gingelly/Sesamum/sesame/til) :	*Sesamum indicum* L. & *S. Orientale* L.
মুগ (Green gram/moong) :	*Vigna radiata* (L). Wilezeu.
চীনাবাদাম (Groundnut/peanut) :	*Arachis hypogea* L.
ঘোড়ামুগ (Horsegram) :	*Dolichos biflorus* L

শস্য	বৈজ্ঞানিক নাম
শংকর নেপিয়ার (Hybrid Napier) :	*Pennesetum purpureum* X *P. typhoides* F_1.
ভারতীয় বীন বা সীম (Indian bean) :	*Dolichos lablab* L.
টোরি সরিষা (Indian rape/toria) :	*Brassica campestris* var *toria* Duth and full.
টিণ্ডা বা ভারতীয় স্কোয়াস (Indian squash melon or tinda) :	*Citrullus vulgaris* var. *fistulosus* L.
জোয়ার (Sorghum) :	*Sorghum bicolor* (L.) Moench
মিঠা পাট (Jute) :	*Corchorus olitorius* L.
কাবুলী ছোলা (Kabuligram) :	*Cicer arietinum* L.
মুসুর (Lentil) :	*Lens esculenta* (L). Moeneh.
ভুট্টা (Maize) :	*Zea mays* L.
মেস্তা (Rozelle) :	*Hibiscus subdariffa* L.
রাই সরিষা (Raya mustard) :	*Brassica uncea* (L). *Czern* and coss.
নেপিয়ার ঘাস (Napier grass) :	*Pennisetum purpureum* Schum
কুসুম (Niger) :	*Guizotia abyssinia* (L). Coss
ধান (Paddy/Rice) :	*Oryza sativa* L.
মটর (Peas) :	*Pisum sativum* L.
আলু (Potato) :	*Solanum tuberosum* L
প্রসোমিলেট্ (Prossomillet) :	*Panicum miliaceum* L.
সূর্যমুখী (Sunflower) :	*Carthamus tinctorius* L.
রেপ্ সরিষা (Rape mustard) :	*Brassica campestris* L. var Isarson Prain
সয়াবীন (Soybean) :	*Glycine max* (L). Merr.
মিষ্টি আলু (Sweet Potato) :	*Ipomea batatus* (L.) Lam.
তারামিরা সরিষা (Taramira) :	*Ercaa sativa* L)
কালোমুগ বা আড় (Black gram/urd) :	*Vigna mungo* (L). Heppur
তামাক (Tabacco) :	*Nicotiana tabacum* L.
ট্রিটিক্যাল্ (Triticale) :	*Triticale hexaploide* Lart.

সারণী 23 : পশ্চিমবঙ্গে বিভিন্ন কৃষি-জলবায়ু অঞ্চলে জমির অবস্থান ও মাটির প্রকার অনুযায়ী উপযুক্ত ফসলচক্র

কৃষি জলবায়ু অঞ্চল	(ক) জমির অবস্থান (খ) মাটির প্রকার	সেচবিহীন এলাকায়			সেচসেবিত এলাকায়		
		খরিফ	রবি	গ্রীষ্ম (প্রাক্-খরিফ)	খরিফ	রবি	গ্রীষ্ম (প্রাক্-খরিফ)
1	2	3	4	5	6	7	8
(1) ল্যাটেরাইট মাটি অঞ্চল : পুরুলিয়া এবং মেদিনীপুর, বাঁকুড়া, বর্ধমান ও বীরভুম জেলার পশ্চিমাংশ	(ক) উঁচু (খ) হালকা	ভুট্টা/জোয়ার/ বাজরা/ মারুয়া/স্বল্প-মেয়াদী অধিক ফলনশীল ধান	কলাই/কুলতি/ টোরি সরষে/ তিল/সরগুজা/ কুসুম	পতিত	ভুট্টা/জোয়ার (উন্নত জাত) / স্বল্পমেয়াদী অধিক ফলন-শীল ধান	গম/সরষে/আলু শীতের সবজি	মুগ/বরবটি/ গ্রীষ্মের সবজি / ভুট্টা/জোয়ার ইত্যাদি
বৃষ্টিপাত 1100-1300 মি.মি.	(ক) মাঝারি (খ) দো-আঁশ	স্বল্পমেয়ারী অধিক ফলন-শীল ধান	ছোলা/	—ঐ—	মধ্যমেয়াদী অধিক ফলন-শীল ধান	গম/সরষে	তিল/মুগ/ বরবটি
মাটি—অম্ল (পি. এইচ. 4·5—6·5)	(ক) নীচু (খ) ভারী	মধ্যমেয়াদী অধিক ফলন-শীল ধান অথবা উন্নত জাতের ধান	খেসারী	—ঐ—	—ঐ—	অধিক ফলনশীল বোরো ধান	ধৈঞ্চা (সবুজ সার)

1	2	3	4	5	6	7	8
(2) গাঙ্গেয় এবং বিন্ধ্য পলিমাটির মধ্যাঞ্চল : গাঙ্গেয় পলিমাটি : নদীয়া এবং মালদহ, পশ্চিম দিনাজপুর, মুর্শিদাবাদ, বর্ধমান, হুগলী, 24-পরগণা জেলার কিছু অংশ	(ক) উঁচু (খ) হালকা	পাট/স্বল্প মেয়াদী অধিক ফলন-শীল ধান	কলাই/ছোলা/ মুসুর/মটর অথবা টোরি/ রাই সরষে	—ঐ—	স্বল্পমেয়াদী অধিক ফলন-শীল ধান	গম/আলু/ শীতের সবজি/ সরষে	পাট/ভুট্টা/ স্বল্পমেয়াদী অঃ ফঃ ধান/ তিল/মুগ/ চীনাবাদাম/ গ্রীষ্মের সবজি
বৃষ্টিপাত 1300-1600 মি. মি. মাটি নিরপেক্ষ	(ক) মাঝারি (খ) দো-আঁশ	মধ্যমেয়াদী অধিক ফলন-শীল ধান	খেসারী (পয়রা ফসল)	—ঐ—	মধ্যমেয়াদী অধিক ফলনশীল ধান	গম/সরষে/ শীতের সবজি	—ঐ—
(3) বিন্ধ্য পলিমাটি : হাওড়া জেলার উত্তরাংশ, হুগলী ও মুর্শিদাবাদ জেলার পশ্চিমাংশ, বাঁকুড়া ও পুরুলিয়া জেলার পূর্বাংশ এবং বর্ধমান ও মেদিনীপুর জেলার মধ্যাংশ	(ক) নীচু (খ) ভারী	ধান (উন্নত জাত)	—ঐ—	ধৈঞ্চা (সবুজ সার)	মধ্যমেয়াদী অঃ ফঃ উন্নত জাতের ধান	অঃ ফঃ বোরো ধান	ধৈঞ্চা (সবুজ সার)

1	2	3	4	5	6	7	8
বৃষ্টিপাত 1200-1500 মি. মি. মাটির অম্ল থেকে নিরপেক্ষ (পি. এইচ. 5-7)							
1500 মি. মি. মাটি অম্ল	(ক) উঁচু (খ) হালকা	স্বল্পমেয়াদী অঃ ফঃ ধান	কলাই	পতিত	স্বল্পমেয়াদী অঃ ফঃ ধান	শীতকালীন শাকসবজি	গ্রীষ্মকালীন শাকসবজি
পরগণা, হাওড়া ও মেদিনীপুর জেলার দক্ষিণাংশ	(ক) মাঝারি (খ) দো-আঁশ	মধ্যমেয়াদী অঃ ফঃ উন্নত জাতের ধান	খেসারী	—ঐ—	মধ্যমেয়াদী অঃ ফঃ ধান	লংকা/তরমুজ/ শাকসবজি/সূর্য-মুখী/কুসুম/ চীনাবাদাম/যব	ধৈঞ্চা (সবুজ সার)
বৃষ্টিপাত 1500 1800 মি. মি. মাটি নিরপেক্ষ থেকে ক্ষার (পি.এইচ.7-8·5)	(ক) নীচু (খ) ভারী	উন্নত জাতের ধান	পতিত	ধৈঞ্চা (সবুজ সার)	উন্নত জাতের ধান	অধিক ফলনশীল বোরো ধান	—
(4) তরাই ও তিস্তা পলিমাটি অঞ্চল : জলপাইগুড়ি ও কোচবিহার জেলার সমতলভূমি, পশ্চিম	(ক) উঁচু (খ) হালকা	স্বল্পমেয়াদী অঃ ফঃ ধান	পতিত	পাট/স্বল্প-মেয়াদী অঃ ফঃ ধান	স্বল্পমেয়াদী অধিক ফলন-শীল ধান	গম/আলু/ সরষে/শীতের সবজি/তামাক	পাট/ভুট্টা/ স্বল্পমেয়াদী অঃ ফঃ ধান/ সবজি

1	2	3	4	5	6	7	8
দিনাজপুর জেলার ইসলামপুর মহকুমা এবং দার্জিলিং জেলার শিলিগুড়ি মহকুমা	(ক) মাঝারি (খ) দো-আঁশ	—ঐ—	—ঐ—	—ঐ—	—ঐ—	গম/সরষে	—ঐ—
বৃষ্টিপাত 2000-3500 মি. মি. মাটি অম্ল (পি. এইচ. 4·2-6·1)	(ক) নীচু (খ) ভারী	মধ্যমেয়াদী অঃ ফঃ উন্নত জাতের ধান	খেসারী	পতিত	মধ্যমেয়াদী অঃ ফঃ ধান	অঃ ফঃ ধান বোরো ধান	—
(5) পাহাড়ী অঞ্চল : শিলিগুড়ি মহকুমা বাদে দার্জিলিং জেলা এবং জলপাইগুড়ি জেলার উত্তর প্রান্ত	1500 মিটার পর্যন্ত উচ্চতায়	ফেব্রুয়ারী-জুলাই ভুট্টা/সবজি অথবা আদা (মার্চ-অক্টোবর)		জুলাই-নভেম্বর সয়াবীন/সবজি/ ভুট্টা ইত্যাদি গম/অধিক ফলনশীল ধান		নভেম্বর-ফেব্রুয়ারী আলু (শীতকালীন)/ সবজি/গম/যব (নভেম্বর-এপ্রিল)/ সবজি	
বৃষ্টিপাত 3000-3500 মি.মি. মাটি অম্ল (পি. এইচ. 4-6)	1500 মিটার উচ্চতার	ভুট্টা/আলু (গ্রীষ্মকালীন)		সবজি (ফুলকপি, বাঁধাকপি ইত্যাদি)		শীতকালীন সবজি/ আলু	

সারণী 24 : ভূমি ব্যবহার পরিসংখ্যান (1,000 হেক্টর) (1980-81)

	পশ্চিমবঙ্গ	ভারতবর্ষ
1. ভৌগোলিক আয়তন	8,785	3,28,778
2. বন	1,184	57,421
3. অকৃষিজ এলাকা	1,293	19,452
4. পতিত ও অচাষযোগ্য এলাকা	121	20,167
5. কৃষির অনুপোযুক্ত মোট এলাকা (3+4)	1,414	39,619
6. স্থায়ী গোচারণ ও অন্যান্য গোচারণ ক্ষেত্র	4	12,008
7. নীট এলাকা ছাড়া অন্যান্য বৃক্ষাদিপূর্ণ এলাকা	162	3,494
8. চাষযোগ্য পতিত জমি	374	16,723
9. পতিত জমি ছাড়া মোট অচাষযোগ্য জমি (6+7+8)	540	32,230
10. পতিত জমি	61	9,817
11. চলতি পতিত জমি	82	14,810
12. মোট পতিত জমি (10+11)	143	24,627
13. নীট চাষের এলাকা	5,565	1,40,270
14. দোফসলী জমির এলাকা	2,055	33,004
15. মোট চাষের জমি (13+14)	7,620	1,73,324
16. মোট জমির মধ্যে শতকরা নীট চাষের এলাকা (%)	62·9%	46·1%
17. মোট সেচযোগ্য এলাকা	1,541	49,585
18. নীট সেচযোগ্য এলাকা	1,489	38,805
19. নীট চাষের এলাকার মধ্যে নীট সেচযুক্ত এলাকার শতকরা পরিমাণ (%)	26·8%	26·7%
20. খাদ্যশস্যের জন্য মোট এলাকা	6,098·7%	1,25,790·4%
21. মোট চাষের এলাকার মধ্যে খাদ্যশস্য উৎপাদনের জন্য জমির শতকরা পরিমাণ (%)	86%	72·6%
22. শস্য উৎপাদনের নিবিড়তা (%)	136·9% (1980) 142·00% (1983)	123·6%

সারণী 25 : পশ্চিমবঙ্গের প্রধান ফসলের এলাকা, উৎপাদন ও গড় ফলন (1983—84)

ফসলের নাম	এলাকা (·000 হে.)	উৎপাদন (·000 টন/বেল পাটের ক্ষেত্রে)	ফলন (কেজি/হে)
1. ধান : (a) আউস	721·4	697·2	966
(b) আমন	4,130·9	5,913·0	1,431
(c) বোরো	520·3	1,330·2	2,557
মোট ধান	5,372·6	7,940·4	1,477·9
2. গম	329·1	854·2	2,595·6
3. ভুট্টা	60·7	79·8	1,314·7
4. অন্যান্য ক্ষুদ্র দানাশস্য	47·2	37·9	—
মোট দানাশস্য	5,809·6	8,912·3	1,534·1
5. ছোলা	62·1	56·7	913·0
6. অড়হর	29·5	30·3	1,027·1
7. অন্যান্য ডালজাতীয় শস্য	282·0	157·8	559·6
মোট ডাল	373·6	244·8	033·2
মোট খাদ্যশস্য	6,183·2	9,157·1	1,480·9
8. মোট তৈলবীজ	373·6	193·9	519·0
9. আখ	20·3	1,022·4	50,364·5
10. পাট	463·5	3,976·8	1,544·3

সারণী 26 : ভারতবর্ষে সার ব্যবহার, উৎপাদন ও আমদানী (·000 টন)

সাল	সার ব্যবহার	উৎপাদন	আমদানী
1973-74	2,838·6	1,374·4	1,242·0
1974-75	2,573·3	1,517·2	1,607·0
1975-76	2,893·7	1,827·7	1,635·0
1976-77	3,410·9	2,387·8	1,050·7
1977-78	4,285·8	2,706·9	1,520·9
1978-79	5,116·9	2,997·9	1,994·0
1979-80	5,255·4	3,019·5	2,005·6
1980-81	5,515·6	3,062·3	2,759·0
1981-82	6,067·2	4,090·0	2,042·1
1982-83	6,418·0	4,413·4	1,131·7
1983-84	7,892·0	4,540·0	1,355·1
1984-85	8,210·9	5,235·2	3,624·8

সারণী 27 : মাটির অম্লত্ব সংশোধন

জলবায়ুভিত্তিক এলাকা ও মাটির প্রকৃতি	প্রয়োজনীয় চূণাপাথরের পরিমাণ (একর প্রতি টনে)		
	পি. এইচ 4·0	পি. এইচ 4·5	পি. এইচ 5·5 থেকে
১। উষ্ণ-আর্দ্র সমতল :			
বেলে এবং দো-আঁশ বেলে	1^{1}	$1\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$
বেলে দো-আঁশ	—	2	1
দো-আঁশ এবং পলি দো-আঁশ	—	$3\frac{1}{2}$	2
কাদা দো-আঁশ	—	5	3
২। শীতল আবহাওয়াযুক্ত পার্বত্য অঞ্চল :			
বেলে এবং দো-আঁশ বেলে	3	2	1
বেলে দো-আঁশ	—	3	2
দো-আঁশ এবং পলি দো-আঁশ	—	$4\frac{1}{2}$	3
কাদা দো-আঁশ	—	6	$3\frac{1}{2}$
৩। উপত্যকা অঞ্চল :			
জৈব ও জলমগ্ন	9	7	$4\frac{1}{2}$

পি. এইচ হচ্ছে অম্লত্ব বা ক্ষারত্বের পরিমাণ।

(উৎস : ভারতীয় কৃষি উন্নয়ন পর্ষদ কর্তৃক প্রকাশিত সংক্ষিপ্ত কৃষিবিজ্ঞান)

সারণী 28 : বিভিন্ন ফসলের পক্ষে উপযোগী অম্লত্ব বা ক্ষারত্ব

ফসলের নাম	উপযোগী পি. এইচের সীমা
ধান	5·0—6·7
গম, যব, যই	5·5—7·5
ভুট্টা	5·5—7·5
ছোলা, মটর, কলাই ইত্যাদি ডালশস্য	6·0—7·5
সরিষা	6·0—7·5
আলু	5·0—6·5
শাকসবজি	5·5—7·5
আখ	6·0—8·0

ফসলের নাম	উপযোগী পি. এইচের সীমা
পেঁয়াজ	6·0—8·0
তামাক	5·5—7·5
কলা	6·0 –7·5
আনারস	5·0—6·5
চা	4·0—5·5
নারিকেল	6·0—7·5
চীনাবাদাম	5·3—6·6
পাট	6·0—7·5

সারণী 29 : প্রধান প্রধান ফসল কর্তৃক অপসৃত খাদ্যের পরিমাণ

ফসলের নাম	শস্যের ফলন (হেক্টর প্রতি কেজিতে)	অপসৃত উদ্ভিদখাদ্য (হেক্টর প্রতি কেজিতে)		
		নাইট্রোজেন	ফসফেট	পটাশ
ধান (লম্বা দেশীজাত)	2820	82	23	123
ধান জয়া (খরিফ)	6138	84	25	147
ধান জয়া (রবি)	6635	105	23	129
গম (লম্বা)	2242	59	29	67
গম (বেঁটে)	5000	140-210	85-104	215-290
জোয়ার	1121	52	18	86
বাজরা	897	30	11	101
ভুট্টা	2690	114	47	105
চীনাবাদাম (খোসা ছাড়ানো)	1906	78	22	45
তুলা (আঁশ)	104	26	20	84
তামাক (শুকনো পাতা)	1121-1345	87	19	53
কফি (দানা)	628	13·8	5·0	16·9
চা (পাতা)	1009	45·4	5·0	20·0
আলু	17575	85	30	140
পাট	1628-1681	112-280	112-123	158-224

বিভিন্ন উদ্ভিদখাদ্যের কার্যকারিতা ও অভাবজনিত লক্ষণ

নাম	কার্যকারিতা	অভাবজনিত লক্ষণ
(ক) মুখ্য খাদ্য		
(1) নাইট্রোজেন	গাছের বৃদ্ধিতে সাহায্য করে। পাতা সবুজ রাখে। ফসফরাস ও পটাসিয়ামের কার্যকারিতা কিছু পরিমাণে নিয়ন্ত্রণ করে। নাইট্রোজেন বেশী হলে পাতা মোটা এবং ঘন সবুজ রং-এর হয়। ফসল পাকতে দেরী হয় ও রোগ-পোকা প্রতিরোধ ক্ষমতা কমে যায়। দানাজাতীয় ফসলের গাছ পড়ে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে।	গাছের শাখাপ্রশাখা ও শিকড়ের বৃদ্ধি ব্যাহত হয়, পাতা হলুদ রং-এর হয়। ফসল তাড়াতাড়ি পাকে, ফলন কমে যায়।
(2) ফসফরাস	গাছের নতুন কোষ গঠন, পাতা ও শিকড় বৃদ্ধি, শীষ বার হওয়া, বীজ এবং দানার গঠন ইত্যাদিতে সাহায্য করে। রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধি করে। শুঁটিজাতীয় ফসলের শিকড়ে অবস্থিত ব্যাকটেরিয়ার কর্মতৎপরতা বাড়ায়।	গাছের বৃদ্ধি ব্যাহত হয়। অনেক সময় কাণ্ড এবং পাতা লালাভ অথবা বেগুণী রং-এর হয়।
(3) পটাসিয়াম	রোগ-পোকার প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ায়, মজবুত শিকড় গঠনে, দানা পুষ্ট হতে ও ফলের গুণগত মান বৃদ্ধি করতে সাহায্য করে। ক্লোরোফিল ও শ্বেতসার গঠনে এবং শর্করা চলাচলে সাহায্য করে। নাইট্রোজেন ও ফসফরাসের উপর নিয়ন্ত্রণের কাজ করে।	পাতা লালাভ বাদামী রং-এর হয় এবং ডগা শুকিয়ে যায়।

নাম	কার্যকারিতা	অভাবজনিত লক্ষণ
(খ) গৌণ খাদ্য		
(1) ক্যালসিয়াম	উদ্ভিদ কোষের প্রাচীর গঠনে বিশেষভাবে সাহায্য করে। শিকড় বৃদ্ধি ও জৈব নাইট্রোজেনকে নাইট্রেটে রূপান্তর করার জন্য সংশ্লিষ্ট মাটির ব্যাকটিরিয়ার কার্যকারিতা বৃদ্ধিতে সাহায্য করে। ক্যালসিয়াম বেশী হলে গাছের কিছু রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধি পায়।	শিকড় ডগার দিকে শুকিয়ে যায় অথবা খাটো এবং মোটা হয়, ফলে ফলন কমে যায়। অভাব বেশী হলে পাতায় ছোপ ছোপ দাগ দেখা যায়।
(2) ম্যাগনেসিয়াম	সবুজ কণিকার একটি প্রয়োজনীয় উপাদান। তৈল গঠনেও সাহায্য করে।	পুরনো পাতা হলুদ হয়ে যায় এবং অভাব বেশী হলে পাতা ঝরে যায়। ভুট্টায়, পাতার আন্তঃশিরায় সাদা ডোরা, তুলায় লালাভ বাদামী ডোরা দেখা যায়, শিরা ঘন সবুজ থাকে।
(3) সালফার (গন্ধক)	খড় এবং পাতার বৃন্ত গঠনে সাহায্য করে।	মূল এবং কাণ্ড খুব লম্বা এবং শক্ত হয়ে যায়, নতুন পাতা হলুদ হয়ে যায়। ফলের ক্ষেত্রে, ফলগুলি ফিকে সবুজ বিকৃত, খোসা মোটা এবং রসহীন হয়ে যায়।
(গ) অনুখাদ্য		
(1) বোরন (সোহাগা)	প্রোটিন ও লিগনিন গঠনে সাহায্য করে। কোষ বিভাজনে সক্রিয় অংশ নেয়। পটাশ ও ক্যালসিয়ামের অনুপাত নিয়ন্ত্রণ করে।	লুসার্নের হলুদ এবং গুচ্ছ, ফলের কর্কিকরণ, টমেটো ফলের কর্কিকরণ এবং গর্ত হওয়া, ফুলকপির কাণ্ড

নাম	কার্যকারিতা	অভাবজনিত লক্ষণ
		ফাঁপা হওয়া এবং ফুলের ব্রোঞ্জের মত রং হওয়া, বীট এবং শালগমের বাদামী গর্ত হওয়া ইত্যাদি বোরনের অভাবজনিত লক্ষণ।
(2) কপার (তামা)	গাছের পুষ্টিতে ও মাটির অবস্থার উন্নয়নে সাহায্য করে। গাছের সবুজ কণিকা গঠনেও সাহায্য করে।	লেবুতে, গাছের ছালের নীচে আঠার থলি, পাতার কক্ষে একাধিক মুকুল, ফলের খোসার উপর আঠার থলি থাকার দরুণ বিশেষ রং হওয়া এবং ফল ফেটে যাওয়া। অন্যান্য গাছের ক্ষেত্রে কাণ্ডের ডগা শুকনো, পাতা কিনারা অথবা দাগ ধরিয়া শুকাইয়া যাওয়া এবং পাণ্ডুরোগ, একাধিক মুকুল গঠন পাতার বিকৃতি, গুচ্ছাকার এবং অতিরিক্ত কষ বাহির হওয়া।
(3) আয়রণ (লৌহ)	এই উপাদানটি সবুজ কণিকা তৈরীর জন্য অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। জীবন্ত কোষের শ্বাস প্রক্রিয়ায় অংশ-গ্রহণকারী কতকগুলি এনজাইম ও সংবাহকের গঠনের জন্যও বিশেষ প্রয়োজন।	কচিপাতায় পাণ্ডুরোগ দেখা দেয়, শিরাগুলি সবুজই থাকে।

নাম	কার্যকারিতা	অভাবজনিত লক্ষণ
(4) ম্যাঙ্গানিজ	উদ্ভিদখাদ্যের রাসায়নিক রূপান্তরে অনুঘটক হিসাবে কাজ করে। সবুজ কণিকা তৈরীর জন্য আয়রণের সঙ্গে কাজ করে এবং নাইট্রোজেন আত্তিকরণ ও এ্যাসকরবিক এ্যাসিড সংশ্লেষে বিশেষ ভূমিকা নেয়। কয়েকটি এনজাইমের কার্যকারিতা বাড়ায়।	পাতায় পাণ্ডুরোগ দেখা। দানা শস্যে ধূসর ফুটকি, সাদা রেখা, শুষ্ক দাগ, ছোট মটরে জলা দাগ, আখে রেখার রোগ, পালিং এবং ধানে হলদে রোগ দেখা দেয়।
(5) মলিবডেনাম	কয়েকটি এনজাইমের অন্যতম উপাদান। তাই এটি নাইট্রোজেন ব্যবহার ও নাইট্রোজেন আবদ্ধকরণের কাজের সঙ্গে যুক্ত। অনোন্যজীবী ও অন্যোন্যজীবী নয় এমন নাইট্রোজেন সংযোগকারী অনুজীবীদের কার্যকারিতা বাড়ায়।	ফুলকপি এবং সরষে জাতীয় ফসলে ছিপটিজাতীয় রোগ দেখা দেয়।
(6) দস্তা	এই উপাদানটি ইণ্ডোল এ্যাসিটিক এ্যাসিড (উদ্ভিদ হর্মোন), নিউক্লিক এ্যাসিড ও প্রোটিন সংশ্লেষে সাহায্য করে, উদ্ভিদকে ফসফেট ও পটাশ ব্যবহারে বীজ গঠনে এবং কোষ-ঝিল্লির আংশিক ভেদ্যতা বজায় রাখতে সাহায্য করে।	গাছের নীচেকার পাতায় আন্তশিরা পাণ্ডুরোগ দেখা দেয়। নীচেকার পাতা বাদামী থেকে বেগুনী রং-এর হয় এবং পরে শুকিয়ে যায়। দস্তার অভাব বেশী হলে কচি পাতাতেও পাণ্ডুরোগ দেখা যায়।
(7) ক্লোরিন	সালোক সংশ্লেষে সহায়তা করে। গাছে জলীয় অংশের ভারসাম্য রক্ষা করে। অধিক ক্লোরিন গাছের জল গ্রহণে অসুবিধা করে।	পাতায় পাণ্ডুরোগ দেখা যায় এবং আস্তে আস্তে শুকিয়ে যায়।

অনুখাদ্য অভাবের কারণ ও তার প্রতিকার

ফসলের বৃদ্ধি, পুষ্টি ও আশানুরূপ ফলনের জন্য নাইট্রোজেন, ফসফেট ও পটাশ এই তিনটি মুখ্য খাদ্য এবং ক্যালসিয়াম, ম্যাগনেসিয়াম ও সালফার—এই তিনটি গৌণ খাদ্য ছাড়া আরও সাতটি অনুখাদ্য প্রয়োজন। এগুলি হল, সোহাগা, তামা, লৌহ, ম্যাঙ্গানিজ, মলিবডেনাম, দস্তা ও ক্লোরিন।

এইসব অনুখাদ্যের চাহিদা গাছপালা সাধারণত মাটি থেকেই মেটায়। কিন্তু অনেক ক্ষেত্রে আজকাল মাটিতে এইসব অনুখাদ্যের অভাব পরিলক্ষিত হচ্ছে।

নিম্নলিখিত কারণগুলির জন্য সাধারণতঃ অনুখাদ্যের অভাব দেখা যায়।

(ক) **অধিক ফলনশীল জাতের চাষ :** একই জমিতে ক্রমাগত অধিক ফলনশীল জাতের চাষ করলে সাধারণতঃ অনুখাদ্যের অভাব দেখা যায়। কারণ, স্থানীয় জাত অপেক্ষা অধিক ফলনশীল জাতের অনুখাদ্যের চাহিদাও বেশী। এসব জমিতে দস্তার অভাব বেশী দেখা যায়।

(খ) **অধিক পরিমাণে সার ব্যবহার :** অধিক পরিমাণে নাইট্রোজেন ফসফেট ও পটাশ প্রয়োগের ফলে মাটিতে অনুখাদ্যের সহজলভ্যতা কমে যায়।

(গ) **যৌগিক সার ব্যবহার :** বর্তমানে নাইট্রোজেন, ফসফেট ও পটাশ-ঘটিত যৌগিক সার ব্যবহারের প্রবণতা বেশী। কিন্তু নাইট্রোজেন, ফসফেট ও পটাশ আলাদাভাবে প্রয়োগ করার ফলে কিছু কিছু অনুখাদ্যও জমিতে প্রয়োগ হত। যেমন সুপার ফসফেটে 26 পিপিএম তামা, 50 পিপিএম দস্তা, 65 পিপিএম ম্যাঙ্গানিজ, 9·5 পিপিএম বোরন বা সোহাগা এবং 3·3 পিপিএম মলিবডেনাম আছে। কিন্তু যৌগিক সার ব্যবহারের ফলে জমিতে এইসব অনুখাদ্যের সরবরাহও কমে যাচ্ছে।

(ঘ) **ফসফেট ঘটিত সারের ব্যবহার :** অ্যামোনিয়াম সালফেট বা অন্য সালফেটঘটিত সার বা মিশ্র সারের প্রয়োগ জমিতে দস্তার সহজলভ্যতা বৃদ্ধি করে। কিন্তু ফসফেট সারের অধিক প্রয়োগ দস্তার লভ্যতা হ্রাস করে।

(ঙ) **ক্ষারজাতীয় নাইট্রেট সার ব্যবহার :** ক্ষারজাতীয় নাইট্রেট সার লোহার লভ্যতা হ্রাস করে।

(চ) **জমির মাটি আচ্ছাদিত থাকার ফলে :** জমিতে খড়ের আস্তরণ ম্যাঙ্গানিজের লভ্যতা হ্রাস করে।

(ছ) জমির সুপরিচর্যার অভাবে : শুধু মলিবডেনাম ছাড়া অন্যান্য সমস্ত অনুখাদ্যই সাধারণতঃ মাটির উপরিভাগ থেকে কয়েক ইঞ্চি নীচে থাকে। সেজন্য প্রয়োজন উপরের ও নীচের মাটি চাষ করে ভালভাবে মিশিয়ে দেওয়া।

(জ) চাষের নিবিড়তা বৃদ্ধির ফলে : একই জমিতে ফসলচক্র অনুযায়ী সারা বছর চাষ করলে জমিতে অনুখাদ্যের অভাব দেখা দিতে পারে।

(ঝ) মৃত্তিকা রসের ঘাটতি বা আধিক্যের জন্য : অনেকদিন ধরে শুকনো অথবা ভিজে অবস্থাও অনুখাদ্যের ঘাটতির কারণ হয়ে দাঁড়ায়। যেমন শুকনো অবস্থায় জমিতে লৌহ ও সোহাগার লভ্যতা হ্রাস পায় আবার জলমগ্ন অবস্থায় জমিতে দস্তার ঘাটতি দেখা যায়।

(ঞ) আবহাওয়ার তারতম্যের জন্য : অনেক জায়গায় শীতকালে দস্তা ও লৌহের অভাব দেখা যায়। অবশ্য এ সময় শিকড়ের কর্মক্ষমতা হ্রাস পাওয়াই এর মূল কারণ। আবার গ্রীষ্মকালে লৌহের অভাব দেখা যায়।

(ট) মাটির গঠন বৈচিত্র্যের জন্য : বেলে ও কাঁকুরে মাটিতে অনুখাদ্যের পরিমাণ কম থাকে। কিন্তু এঁটেল-দো-আঁশ, দো-আঁশ ইত্যাদি মাটিতে অনুখাদ্য অপেক্ষাকৃত বেশী থাকে।

ফসলে বিভিন্ন অনুখাদ্যের ঘাটতির সীমা :

অনুখাদ্যের নাম	ঘাটতির সীমা
(ক) সোহাগা	15 পিপিএম
(খ) তামা	4 পিপিএম অপেক্ষা কম
(গ) লৌহ	50 " " "
(ঘ) ম্যাঙ্গানিজ	20 " " "
(ঙ) মলিবডেনাম	0·1 পিপিএম
(চ) দস্তা	20 পিপিএম অপেক্ষা কম।

কেবলমাত্র ব্যাপকহারে অনুখাদ্যের অভাব দেখা গেলেই অনুখাদ্য জমিতে প্রয়োগ করা উচিত। অন্যথায় জমিতে অনুখাদ্যের পরিমাণ বৃদ্ধি পেলে তা গাছে বিষক্রিয়ার সৃষ্টি করবে। সাধারণতঃ চার ভাবে অনুখাদ্যের অভাবজনিত সমস্যার প্রতিকার করা যায়—

১। তামা, লৌহ, মলিবডেনাম ও দস্তাঘটিত রাসায়নিক বীজের সঙ্গে মাখিয়ে বীজ লাগানো,

২। 0·2 শতাংশ জিংক সালফেট দ্রবণে অথবা 2-3 শতাংশ জিংক অক্সাইড তরলে শিকড় ডুবিয়ে নেওয়া,

৩। বোরন, তামা ও দস্তার জলীয় দ্রবণ ফসলের পাতায় স্প্রে করে,

৪। বোরন, তামা ও দস্তা ঘটিত উপযুক্ত রাসায়নিক মাটিতে প্রয়োগ করে।

সারণী 30 :

অনুখাদ্যের নাম	উৎস	মাটিতে প্রয়োগের হার (কেজি/হেক্টরে)	পাতায় প্রয়োগের হার (শতকরা)
১। বোরন	বোরাক্স	10—20	0·5—1
২। তামা	কপার সালফেট	5—25	0·1 কপার সালফেট + 0·5 চুণ।
৩। লৌহ	ফেরাস সালফেট	10—30	0·4 ফেরাস সালফেট + 0·2 চুণ
৪। ম্যাঙ্গানিজ	ম্যাঙ্গানাস সালফেট	50—100	0·6 ম্যাঙ্গানাস সালফেট + 0·3 চুণ
৫। মলিবডেনাম	সোডিয়াম মলিবডেট	0·25—0·50	0·05
৬। দস্তা	জিংক সালফেট	10—200	0·2—0·6 জিংক সালফেট + 0·1—0·3 চুণ

অনুমোদিত প্রয়োগ পদ্ধতি হচ্ছে 7—10 দিন অন্তর 2—6 বার গাছের পাতায় স্প্রে করা অথবা চাষের আগে বা বীজ বসানোর সময় বীজের নীচে প্রয়োগ করা।

সারণী 31 ঃ পশ্চিমবঙ্গের কৃষক পরিবার ও কৃষিজমি

কৃষক-পরিবার	মোট কৃষক পরিবারের শতকরা অংশ	অধীনস্থ জমি (মোট কৃষিজমির শতকরা অংশ)
ভূমিহীন ও প্রান্তিক কৃষক পরিবার (1 হেক্টার পর্যন্ত জমির মালিক)	60	21·5
ক্ষুদ্র কৃষক (1 থেকে 2 হেক্টর পর্যন্ত জমির মালিক)	22·3	25·7
মধ্যবিত্ত কৃষক (2 থেকে 4 হেক্টর পর্যন্ত জমির মালিক)	13·2	20·0
উচ্চবিত্ত কৃষক (4 হেক্টরের বেশী জমির মালিক)	4·5	23·8

* মোট কৃষক পরিবারের সংখ্যা ঃ 55 লক্ষ

* মোট ভূমিহীন ক্ষেতমজুর পরিবারের সংখ্যা ঃ 25 লক্ষ

* ভূমিহীন ক্ষেতমজুর ঃ
মোট ক্ষেতমজুরের শতকরা অংশ—1961 সালে 28·9
1971 সালে 45·3
1981 সালে

সারণী 32 ঃ পশ্চিমবঙ্গের জোত-জমির বাঁটোয়ারা

জোতের শ্রেণী (জমির পরিমাণভিত্তিক)	শ্রেণীভুক্ত জোতের সংখ্যা (হাজারে)	মোট জোতের শতকরা অংশ	জমির পরিমাণ (হাজার হেক্টর)	মোট জমির শতকরা অংশ
1. 0·5 হেক্টরের কম	1,558	36·95	381	7·53
2. 0·5 থেকে 1 হেক্টরের মধ্যে	971	23·03	709	14·01
3. 1 থেকে 2 হেক্টরের মধ্যে	942	22·34	1,302	25·72
4. 2 থেকে 3 হেক্টরের মধ্যে	412	9·77	969	19·14
5. 3 থেকে 4 হেক্টরের মধ্যে	145	3·44	496	9·80
6. 4 থেকে 5 হেক্টরের মধ্যে	98	2·32	425	8·40
7. 5 থেকে 10 হেক্টরের মধ্যে	87	2·06	548	10·83
8. 10 থেকে 20 হেক্টরের মধ্যে	3	0·07	36	0·71
9. 20 থেকে 50 হেক্টরের মধ্যে	0·1	—	3	0·06
10. 50 হেক্টরের উপর	0·3	0·04	193	3·81

(একটি কৃষক পরিবারের অধীনে মোট যে পরিমাণ চাষের জমি থাকে সেই পরিমাণ জমিকে একটি জোত বলা হয়েছে।)

সারণী 33 : পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জেলায় মাসিক গড় বৃষ্টিপাতের পরিমাণ (মিলিমিটার)

জেলা	জানুয়ারী	ফেব্রুয়ারী	মার্চ	এপ্রিল	মে	জুন	জুলাই	আগস্ট	সেপ্টেম্বর	অক্টোবর	নভেম্বর	ডিসেম্বর	মোট (বার্ষিক)
উঃ 24-পরগণা	11·9	27·9	34·0	50·5	133·9	290·1	331·2	334·0	252·7	127·3	27·2	4·1	1,624·8
দঃ 24-পরগণা	14·2	25·7	28·2	42·4	104·4	303·0	394·5	379·5	256·0	213·9	34·8	6·1	1,802·7
নদীয়া	12·5	27·4	39·9	67·3	159·0	261·4	286·3	271·0	196·6	122·7	25·9	3·6	1,473·6
মুর্শিদাবাদ	9·1	20·6	24·1	46·0	132·1	244·1	281·2	298·2	228·6	110·7	17·8	4·1	1,416·6
বর্ধমান	13·5	32·5	39·1	55·6	139·2	256·8	333·3	317·0	216·9	94·5	25·1	5·1	1,528·6
বীরভূম	32·7	8·8	20·0	21·0	62·0	177·7	328·7	272·0	320·7	151·8	23·1	3·5	1,422·0
বাঁকুড়া	18·3	28·7	27·2	35·1	93·7	257·8	335·8	318·5	196·9	88·4	17·5	3·6	1,421·5
পঃ মেদিনীপুর	15·2	33·5	34·8	51·6	119·6	252·2	333·5	341·6	226·8	114·3	31·5	5·1	1,559·7
পূঃ মেদিনীপুর	13·5	11·0	15·5	25·9	135·5	279·1	303·0	366·9	344·8	238·8	60·0	4·3	1,798·1
হুগলী	14·7	36·3	35·6	66·8	145·5	249·9	300·0	302·5	220·7	102·6	20·9	5·3	1,50[illegible]·3
হাওড়া	15·7	34·3	34·8	53·6	144·3	303·3	360·9	3 6·4	208·0	127·8	24·6	4·1	1,667·5
জলপাইগুড়ি	6·9	17·0	33·3	113·8	302·3	683·8	773·9	658·1	560·6	150·1	14·2	4·3	3,319·1
দার্জিলিং	10·9	31·7	5[illegible]·9	113·3	231·4	597·1	809·5	643·3	445·5	142·5	19·6	6·3	3,105·5
মালদহ	10·9	21·6	18·0	34·5	115·6	252·7	292·6	283·2	287·3	120·9	14·0	1·8	1,453·1
পঃ দিনাজপুর	8·4	19·3	19·1	48·6	179·6	334·5	363·2	365·0	309·1	155·7	9·7	1·3	1,813·5
কোচবিহার	7·6	19·8	38·9	156·2	426·7	833·9	747·8	580·1	591·8	191·3	10·2	3·3	3,607·6
পুরুলিয়া	8·9	13·1	11·2	20·4	40·3	193·3	338·8	306·2	269·2	73·9	19·0	1·3	1,306·6

(2) বিভিন্ন কৃষিতথ্য :

সারণী 34 : ভারতবর্ষ ও পশ্চিমবঙ্গের সার ব্যবহারের অগ্রগতি

(খাদ্য উৎপাদন হিসাবে নাইট্রোজেন, ফসফেট ও পটাশের পরিমাণ ·000 টনে)

সাল	ভারতবর্ষ				পশ্চিমবঙ্গ				
	নাইট্রোজেন	ফসফেট	পটাশ	মোট	নাইট্রোজেন	ফসফরাস	পটাশ	মোট	শতকরা বৃদ্ধির পরিমাণ
1975-76	2148·6	466·8	278·3	2983·7	86·0	23·8	19·9	129·7	
1976-77	2456·9	634·9	319·2	3410·9	101·5	27·0	23·9	152·5	17·6
1977-78	2913·0	866·6	506·2	4285·8	113·9	29·0	29·2	172·1	12·8
1978-79	3419·5	1106·0	591·5	5116·9	146·4	53·1	44·0	243·5	41·5
1979-80	3498·1	1150·9	606·4	5255·4	144·9	62·9	32·9	240·7	(—)1·2
1980-81	3678·1	1213·6	623·9	5515·6	167·3	70·8	44·7	282·8	17·5
1981-82	4068·7	1322·3	676·2	6067·2	157·0	62·5	39·1	258·6	(—)8·6
1982-83	4242·5	1432·7	726·3	6401·4	164·1	56·2	40·2	260·5	0·7
1983·84	5236·0	1757·0	799·2	7792·2	218·6	74·2	51·5	344·3	32·2
1984-85	5333·3	1795·0	846·4	7974·7	246·2	91·8	67·6	405·6	15·1

- ভারতবর্ষে হেক্টার প্রতি মোট সার ব্যবহারের পরিমাণ (1984-85) : 46·0 কেজি।
- সারা ভারতের সার ব্যবহারের মধ্যে পশ্চিমবঙ্গে অংশ : 4·4%
- পশ্চিমবঙ্গে হেক্টার প্রতি মোট সার ব্যবহারের পরিমাণ (1984-85) : 55·0 কেজি।

1943-44 সালকে যদি রাসায়নিক সার ব্যবহার সুরুর বছর ধরা হয়, তাহলে পরবর্তী 10 বছরে পশ্চিমবঙ্গের তৎকালীন প্রতি একক চাষযোগ্য জমিতে যে পরিমাণ রাসায়নিক সার গড়ে ব্যবহৃত হয়েছে তা খুবই সামান্য। 1953-54 সাল থেকে ঢিমে তালে 1958-59 সাল পর্যন্ত সার ব্যবহার বেড়েছে। প্রকৃতপক্ষে 1959-60 সাল থেকেই এরাজ্যে রাসায়নিক সার ব্যবহার বৃদ্ধি পেতে সুরু করে। পরবর্তী 5 বছরে এই বৃদ্ধি 100%-এ পৌঁছেছে। এর পরবর্তী পর্যায়ে বৃদ্ধির হার সন্তোষজনক হলেও সেরকম দ্রুতহারে বৃদ্ধি পায়নি। সত্তর দশকের সুরু করে এরাজ্যে 450% সার ব্যবহার বৃদ্ধি পায়। এই বৃদ্ধির হার মোটামুটিভাবে সারা ভারতে গড় ব্যবহার বৃদ্ধির সঙ্গে তাল রেখে চলেছে। তবে এই বৃদ্ধির হার পাঞ্জাব ও উত্তর প্রদেশের চেয়ে কম। মধ্যপ্রদেশে এই বৃদ্ধির হার পশ্চিমবঙ্গের চেয়ে বেশী। কিন্তু প্রতি একক জমিতে সার ব্যবহার পশ্চিমবঙ্গেই বেশী হয়েছে। অন্যদিকে তামিলনাড়ু ও অন্ধ্রপ্রদেশে রাসায়নিক সার ব্যবহার বৃদ্ধির হার এ রাজ্যের তুলনায় কম হলেও প্রতি একক জমিতে সার প্রয়োগের মোট পরিমাণ তুলনামূলকভাবে এ রাজ্যকে ছাড়িয়ে গেছে।

আগেই বলা হয়েছে, এরাজ্যে সার ব্যবহারের অন্যতম উল্লেখযোগ্য ঘটনা হ'ল, মোট ব্যবহৃত সারের 65% এই রাজ্যের কৃষকরা গ্রীষ্মকালে রবি মরসুমের চাষে ব্যবহার করে থাকেন এবং 35% ব্যবহার করে থাকেন খরিফ মরসুমে। অথচ রবি মরসুমে মোট চাষের এলাকা মাত্র 24% এবং খরিফে 76%, একথা আগেই বলা হয়েছে। সারণী 22 থেকে একটি জিনিস লক্ষ্য করার বিষয় যে, ষাট দশকের মাঝামাঝি সময়ে নাইট্রোজেন সার বেশী ব্যবহৃত হতো। তারপর যথাক্রমে পটাশ ও ফসফেট ঘটিত রাসায়নিক সারের স্থান ছিল। এ রাজ্যের কৃষকরা সার ব্যবহারের সুরু থেকে প্রথমে শুধু নাইট্রোজেন সারই এবং পরের বছরগুলিতে অধিক পরিমাণ নাইট্রোজেন সার ব্যবহার করেছেন। অবশ্য উল্লেখযোগ্য যে, উদ্ভিদ খাদ্য হিসাবে গাছ মাটি থেকে নাইট্রোজেন সারই সর্বাধিক পরিমাণ গ্রহণ করে এবং তাই মাটিতে নাইট্রোজেন সার বেশী পরিমাণ প্রয়োগ করতে হয়। সত্তর দশকের মাঝামাঝি সময় থেকে মোট ফসফেট সার ব্যবহার পটাশ সারকে ছাড়িয়ে যায়। নাইট্রোজেন সারের ব্যবহার যথারীতি বেড়ে চলে। বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গে মোট যে পরিমাণে সার ব্যবহার হয়, তার 62% নাইট্রোজেন সার। বাকী 38% এর মধ্যে 27% ফসফেট সার এবং 11% পটাশ সার।

সারণী 35 ঃ সার ব্যবহারের তুলনামূলক চিত্র ও পশ্চিমবঙ্গের স্থান (কেজি/হেক্টার)। [1977-78 সালের হিসাব]

দেশ ও রাজ্য	নাইট্রোজেন সার	ফসফেট সার	পটাশ সার
নেদারল্যাণ্ড	217·0	42·0	50·2
মিশর	162·0	24·1	1·0
জাপান	124·9	135·4	126·6
অষ্ট্রেলিয়া	0·4	1·6	0·2
সারাবিশ্ব	10·6	6·3	5·2
পন্ডিচেরী	89·6	21·5	39·4
পাঞ্জাব	51·1	16·7	4·6
উত্তরপ্রদেশ	27·8	6·0	3·1
তামিলনাড়ু	36·7	10·1	12·2
অন্ধ্রপ্রদেশ	27·1	10·3	2·9
পশ্চিমবঙ্গ	14·1	3·6	3·7
আসাম	1·5	0·1	0·2
সারাভারত	17·0	5·0	3·0

(উৎস ঃ Fertilizer Statistics, FAI).

(3) **পূর্বভারত ও পশ্চিমবঙ্গের খরাপরিস্থিতিতে বিভিন্ন প্রকার গবেষণামূলক পরীক্ষা-নিরীক্ষার ফলাফল**

ছোটনাগপুর এলাকার অসমতল এবং খাড়াই ঢালু এলাকায় মাটির বৈশিষ্ট্য ও সঞ্চিত রসের পরিমাণ ভিন্নতর। দেখা গেছে, রাঁচীর কাঁকীতে ক্ষয়ীভুত ঢালু ও উঁচু এলাকায় গড় রসের মাত্রা (average moisture content) গাছের শুকিয়ে যাওয়ার সহগের (wilting coefficients) সামান্য উপরে বিশেষ করে নভেম্বর থেকে ফেব্রুয়ারী মাসে যখন তাপমাত্রা কম থাকে। সাধারণতঃ এসব এলাকায় 15—30 সেমি· স্তরে বছরের অধিকাংশ সময়ে সর্বদাই গড় রসের মাত্রা শুকিয়ে যাওয়া সহগের উপরে থাকে।

চৌধুরী ও চ্যাটার্জী (1967) পরীক্ষা করে দেখেছেন, রাঁচীর কাঁকীতে যেখানে **শুকিয়ে যাওয়া সহগ** 9·5% এবং মাঠের ধারণ ক্ষমতা (field capacity)

21%, সেখানে বার্লি, ছোলা এবং তিসি প্রভৃতি শীতকালীন ফসল বিনা সেচে বেশ লাভজনকভাবে চাষ করা সম্ভব। অক্টোবর থেকে ফেব্রুয়ারী মাস পর্যন্ত এইসব এলাকায় 30 সেমি. গভীরতার নীচেও যথেষ্ট সঞ্চিত রস থাকে। 75-90 সেমি. গভীরতায় মাটির রসের পরিমাণ অক্টোবরে 21-22 থেকে নেমে ফেব্রুয়ারীতে 17-18% এ দাঁড়ায়। তাঁরা পরীক্ষা করে দেখেছেন, শংকর ভুট্টা চাষের পর (ফলন 55 কু./হে.) বিনা সেচে গম (ফলন 4·7 কু./হে.), বার্লি (6·7 কু./হে.), ছোলা (7·9 কু./হে.) এবং তিসির (5·9 কু./হে.) ফলন খড়ের মালচিং এ বৃদ্ধি পেয়ে যথাক্রমে 5·9, 8·6, 10·3 এবং 8·0 কু./হে. পাওয়া গেছে। সুতরাং খড়ের মালচিং (যা কৃষকদের পক্ষে খুবই সহজলভ্য) অলড্রিন সহযোগে ব্যবহার করে বিনা মালচিং অপেক্ষা বেশী ফলন সহজেই পাওয়া যায়। এতে মাটিতে ভালভাবে রস শোষিত হয়।

সিনহা ও চাটার্জী (1968) রাঁচীর ঢালু ক্ষয়ীভুত এলাকায় মাটির রস ও ছ'টি বহুবর্ষজীবি ঘাসের শিকড়ের পরিমাণ 0—15, 15—30, 30—45 45—60, 60—75 এবং 75—90 সেমি গভীরতায় মার্চ, মে ও সেপ্টেম্বরে পরীক্ষা করে দেখেছেন। বেলে—দোঁয়াশ উঁচু জমির মাটিতে 10—15 সেমি গভীরতায় শুকিয়ে যাওয়া সহগের পরিমাণ ছিল 6·52%। কেবলমাত্র মে মাসে 0—15 সেমি গভীরতায় রসের পরিমাণ (4·15%) শুকিয়ে যাওয়া সহগের নীচে নেমে গেছিল। 75—90 সেমি. গভীরতায় রসের পরিমাণ কিছুটা বেশী ছিল (15%)। **Pennisetum polystachyon, Brachiaria brizantha** এবং **Andropogon gayanus** ঘাসের ক্ষেত্রে মোট মূলের ওজনের 70—80% 0—15 সেমি. মাটির গভীরতায় পাওয়া যায়। দেশী ঘাসের ক্ষেত্রে, যেমন—**Dicanthium annulatum, Heteropogon contortus** এবং **Dicanthium caricosum** প্রভৃতি ঘাসের মূলের ওজনের 50—60% 0—15 সেমি. মাটির গভীরতায় পাওয়া যায়। 75—90 সেমি. গভীরতায় মোট মূলের ওজনের মাত্র 2—3% শিকড় পাওয়া যায়। কিন্তু **Dicanthium caricosum** ঘাসের শিকড় ঐ একই গভীরতায় শুষ্ক শীতকাল ও বসন্তকালে 7% পাওয়া যায়। সুতরাং শুষ্ক এলাকায় ঢালু ও ক্ষয়ীভুত জমিতে ঘাসচাষ করলে তাদের শিকড় বৃদ্ধি জনিত সুফল মাটিতে সঞ্চিত রস সংরক্ষণে প্রভুত উপকার করে।

মৃত্তিকা ও জল সংরক্ষণে বিভিন্ন ঘাসের প্রভাব (বিশেষ করে পূর্ব ভারতে) বিষয়ে চ্যাটার্জী ও মাইতি (1978) একটি সমীক্ষা করে দেখেছেন যে, আচ্ছাদন বা ঢাকা শস্য হিসাবে শুষ্ক এলাকার হালকা মাটিতে ঘাসের চাষ করলে মাটির গঠন ও গ্রথণ উন্নত হয়, সঞ্চিত রসের সংরক্ষণ বৃদ্ধি পায়, মাটির ছিদ্রতা (pore space) এবং জল ধারণ ক্ষমতা বাড়ে, রান্ অফ্ বা গড়িয়ে যাওয়া জল ও মাটির ক্ষয় কমে এবং মাটির উর্বরতা উন্নততর হতে সাহায্য করে।

চ্যাটার্জী, রায় এবং ভট্টাচার্য (1971) পূর্ব ভারতের শুষ্ক ও খরাপ্রবণ এলাকায় উঁচু ও মাঝারি জমিতে 1953-1970 সাল পর্যন্ত **Pennisetum pedicellatum** ঘাস চাষের ব্যাপক গবেষণা চালিয়েছেন। তাঁরা পরীক্ষা করে এই সিদ্ধান্তে এসেছেন যে, 80—90 দিনের মাথায় এই ঘাস কেটে তার শিকড়গুলি যদি মাটিতে ভালভাবে মিলিয়ে দেওয়া যায়, তাহলে জমিতে যথেষ্ট পরিমাণ জৈব পদার্থ বৃদ্ধি পাবে। এর ফলে ঐ জমিতে পরবর্তী ফসল চাষে সহজেই উৎপাদন অনেকগুণ বেড়ে যাবে এবং মাটির সামগ্রিক উর্বরতা অনেক বাড়বে। আধুনিক বহুমুখী শস্য চাষে তাই এই ঘাস চাষ খুবই লাভজনক।

সেনগুপ্ত ও ভট্টাচার্য (1981) শুষ্ক চাষ পদ্ধতিতে কলাই বীজের অঙ্কুরোদ্গমের উপর কল্যাণীতে বিধানচন্দ্র কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের এক পরীক্ষা চালিয়েছেন। তাঁরা মে—আগষ্ট এবং সেপ্টেম্বর—ডিসেম্বর, 1981 সালে দুটি ঋতুতেই কলাই (**Vigna mungo** L.) বীজের সঙ্গে সোডিয়াম ফসফেট (Na_2HPO_4), পলিইথিলিন গ্লাইকল্ প্রভৃতির বিভিন্ন দ্রবণ (Concentration), আইওডিন বাষ্প এবং সাধারণ জল শোষণ করিয়ে সতেজ চারা তৈরী, উন্নততর শিকড়বৃদ্ধি, শিকড়ে অর্বুদসংখ্যা (Nodules) এবং অধিক ফলনের উপর এদের সুফল বিষয়ে পরীক্ষা করেছেন। এদের মধ্যে সোডিয়াম ফসফেট ও পলিইথিলিন গ্লাইকলের উচ্চতম দ্রবণ এবং এদের যৌথ ব্যবহারে ভাল ফল পাওয়া গেছে। তবে সাধারণভাবে কলাই বীজ জলে ভিজিয়ে (20—24 ঘণ্টা) জমিতে ছড়ালেও শুকনো বীজ ছড়ানোর থেকে বেশী সুফল পাওয়া যাবে।

সিং ও চ্যাটার্জী (1980) উঁচু জমিতে শুষ্ক চাষ পদ্ধতিতে সোজাসুজি বোনা ধানের উপর পরপর তিন বছর ধরে কল্যাণীতে একটি পরীক্ষা চালিয়েছেন। তাঁরা বীজ বোনার আগে (১) সোডিয়াম ফসফেট (Na_2HPO_4), জল

(24 ঘণ্টা দুবার ভিজিয়ে) এবং এ্যালুমিনিয়াম নাইট্রেট [$Al(NO_3)_3$] দ্রবণ সমূহে বীজ মিশিয়ে, (২) ফসফেট গঠিত সার ব্যবহার করে এবং (৩) অনুখাদ্য (দস্তাঘটিত সালফেট, $ZnSO_4$) ও এগ্রোমিন যাতে Mg, Zn, Fe, Cu, Mn, B ও Mo চিলেট্ অবস্থায় থাকে ব্যবহার করে দেখেছেন যে, প্রতিটি উপরিবর্ণিত দ্রব্য ব্যবহারে যথাক্রমে 20—25, 10 এবং 15% ধানের ফলন বৃদ্ধি পায়। এর অন্তর্নিহিত মূল কারণ হ'ল, শস্যের উন্নত সংখ্যাসহ প্রতিষ্ঠা, উন্নততর শিকড় বৃদ্ধি সহ গাছের তাড়াতাড়ি বৃদ্ধি এবং একক এলাকায় আসল ফলপ্রদ পাঁশকাঠি ও শীষের সংখ্যা, পরিপূর্ণ দানার শতকরা পরিমাণ এবং হাজার দানার ওজন প্রভৃতির উন্নতি বৃদ্ধি। দেশী জলার ধান অপেক্ষা আই. ই. টি. 2914 জাতের ধানে অধিক পরিমাণ ফলন পাওয়া গেছে।

খান ও চ্যাটার্জী (1980) দুবছর ধরে গমচাষের একটি পরীক্ষায় দেখেছেন যে, গমবোনার সময় এবং বোনার আগে জলে বীজ শোষণ গাছের গঠন বৃদ্ধি ও অধিক ফলনে বিশেষ উপকারী, বিশেষ করে নভেম্বরের প্রথমার্ধে এইভাবে গম বুনলে সর্বোচ্চ ফলন পাওয়া যায়। নভেম্বরের 15 তারিখের পর দেরীতে গম বুনলে ফলন অনেক কমে যায়। সুতরাং 8—10 ঘণ্টা জলে ভিজিয়ে নভেম্বরের প্রথমার্ধের মধ্যে অপেক্ষাকৃত কম শুষ্ক এলাকায় বা আবহাওয়ায় গম বুনলে গমের ফলন বৃদ্ধি পায়।

অনুরূপভাবে বার্লির উপর শুষ্ক অবস্থায় সিং ও চ্যাটার্জী (1980) দু'বছর ধরে কল্যাণীতে একটি গবেষণা চালিয়ে দেখেছেন যে, সোডিয়াম ফসফেট ($Na_2HPO_4 \cdot {}_{12}H_2O$) দ্রবণ (358 পিপি এম 6 ঘণ্টার জন্য) ও জল (24 ঘণ্টার জন্য) শোষণ করিলে বার্লি বীজ বুনলে এমনি শুকনো বোনা অপেক্ষা যথাক্রমে 37 ও 24% ফলন বৃদ্ধি পায়। এই ফলন বৃদ্ধির মূল কারণ হ'ল, একক এলাকায় শীষের অধিক সংখ্যাবৃদ্ধি, প্রতি শীষে পুষ্ট দানার সংখ্যাবৃদ্ধি এবং ভারী পূর্ণ দানার প্রভৃতি।

খান ও চ্যাটার্জী (1982) 'টি 144' জাতের মুগ (**Vigna radiata Linn. Wilczek**) গম –মুগ—ধান (রোয়া) শস্য পর্যায়ের মধ্যে চাষ করে 9কু./হে. ফলন পাওয়া সম্ভব বলে পরীক্ষা করে দেখিয়েছেন। এছাড়া, এতে প্রায় 45 কু./হে. (শুকনো ওজন) শিম্বি গোত্রীয় ফসলের অবশিষ্টাংশ (শিকড় ছাড়া)

মাটিতে জৈবসার হিসাবে মেশানো যাবে। মার্চ—এপ্রিল থেকে মে—জুন মাসে 65 দিনের মাথায় এই অবশিষ্টাংশ মাটিতে মেশানো যাবে এবং এতে পরবর্তী ধান চাষে প্রভূত উপকার ও ফলন বৃদ্ধি সম্ভব। এই মুগ চাষ গম চাষের পর মার্চ—এপ্রিলের একটি বৃষ্টির জলে (20 মি. মি.) বিনা চাষে বুনে তার থেকে ভাল ফলন পাওয়া সম্ভব। এতে মাটিতে সঞ্চিত রসের কার্যকারিতার সুফল অধিক পাওয়া যাবে।

অনুপঞ্জিকা (References)

বাংলা পত্র-পত্রিকা ও বই ঃ

১। শুষ্ক চাষ পদ্ধতি – বিমল বিহারী দাস ও বলাই লাল জানা, 'বিজ্ঞান জগৎ', পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ, ৪র্থ সংখ্যা, ১৯৮৩।

২। পশ্চিমবঙ্গ খরাপ্রবণ এলাকার কৃষি – কয়েকটি শস্য পর্যায়—বলাই লাল জানা, 'সার সমাচার', শ্রাবণ, ১৩৮৭, ২৫—২৯।

৩। শুষ্ক এলাকার চাষবাসে আধুনিক প্রযুক্তিবিদ্যা—অশোক কুমার করণ, 'সারসমাচার', শ্রাবণ—আশ্বিন, ১৩৮৮।

৪। সেচবিহীন বা সীমিত সেচ এলাকায় চাষবাদের কলাকৌশল—সুনীল রায়, বাঁকুড়া পুরুলিয়া অঞ্চলে সীমিত সেচে একাধিক ফসলের চাষ সম্পর্কে আলোচনা চক্র, ১০ই সেপ্টেম্বর, ১৯৮০, ভারত-জার্মান সার প্রশিক্ষণ প্রকল্প, (হিন্দুস্থান সার সংস্থা) পশ্চিমবঙ্গ।

৫। পুরুলিয়া জেলা—আধুনিক নিবিড় শুষ্ক চাষ পদ্ধতির প্রায়োগিক চিন্তাধারা—বলাই লাল জানা, 'নবান্ন ভারতী', ১৩ বর্ষ, ৪র্থ-৫ম সংখ্যা, পৌষ—মাঘ ১৩৮৭ ঃ ২৩৫—২৩৮।

৬। পুরুলিয়া জেলায় গম চাষের সমস্যা ও সম্ভাবনা—বলাই লাল জানা, 'করমতীর্থ', ২য় বর্ষ, ৮ম সংখ্যা, ৫ই ডিসেম্বর '৮১ ঃ ৮—১০।

৭। নিবিড় শুষ্ক চাষ পদ্ধতি—বলাই লাল জানা, 'সবুজ সোনা', ৪র্থ বর্ষ, ২য় সংখ্যা, ২রা মাঘ, ১৩৮৭ ঃ ৩—৪।

৮। মরুভূমিতে সবুজ বিপ্লব—সিদ্ধার্থ বন্দ্যোপাধ্যায়, 'আজকাল', ২রা ডিসেম্বর, ১৯৮২, ৫ম পৃষ্ঠা।

৯। কৃষি আলোচনাচক্র, ভারত-ব্রিটিশ সার প্রশিক্ষণ প্রকল্প, হিন্দুস্থান ফার্টিলাইজার কর্পোরেশন লিঃ, পুরুলিয়া, ২৩শে নভেম্বর, ১৯৮২।

১০। সেচবিহীন এলাকায় ডালশস্য ও তৈলবীজ শষ্যের চাষ করুন—বলাই লাল জানা 'বাংলার মুখ', কার্তিক—অগ্রহায়ণ, ১৩৮৬।

১১। পশ্চিমবাংলায় তৈলবীজ শস্যচাষের সম্ভাবনা—বলাই লাল জানা, 'সারসমাচার', কার্তিক, ১৩৮৪ ঃ ৮—১১।

১২। পশ্চিমবাংলার মাটি—বাণীভূষণ রুদ্র, 'সার সমাচার,' কার্তিক, ১৩৮৩ : ১৭—২১।

১৩। কৃষি সহায়িকা, ভারত-জার্মান সার প্রশিক্ষণ প্রকল্প, পশ্চিমবঙ্গ ১২-বি, রাসেল ষ্ট্রীট, কলিকাতা—৭০০০৭১, দ্বিতীয় সংকলন, ১৯৮১।

১৪। গাছের খাদ্য ও সার—হিন্দুস্থান ফার্টিলাইজার কর্পোরেশন লিঃ, সার সম্প্রসারণ ও গবেষণা বিভাগ, পশ্চিমবঙ্গ (৩য় সংস্করণ, ১৯৮৩), ৫২-এ শেকস্পীয়ার সরণী, কলিকাতা-৭০০০১৭।

১৫। শস্যসাথী, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, কৃষি অধিকার, ডালশস্য ও তৈলবীজ গবেষণা কেন্দ্র, বহরমপুর (১৯৮১)।

১৬। মৌলিক কৃষি বিজ্ঞান—বলাই লাল জানা, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যপুস্তক পর্ষদ, ৬-এ রাজা সুবোধ মল্লিক স্কোয়ার, কলিকাতা-৭০০০১৩।

১৭। ঐচ্ছিক কৃষি বিজ্ঞান—বলাই লাল জানা, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ।

১৮। পূর্বভারতের ফসল—মতিলাল মজুমদার, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ।

১৯। খরায় চাষ চিন্তা—দেবব্রত সরকার, 'সারসমাচার,' কার্তিক - পৌষ, ১৩৮৯, ৯—১২।

২০। প্রচলিত রাসায়নিক সারগুলির বৈশিষ্ট্য ও উপযোগিতা—ডঃ অজয় কর, 'সার সমাচার', কার্তিক—পৌষ, ১৩৮৯ : ১৩—১৭।

২১। ফলমূল ও শাকসব্জী চাষে বিশেষ নজর দিন—বলাই লাল জানা, 'সার সমাচার', কার্তিক—পৌষ, ১৩৮৯ : ২৫—২৮।

২২। পশ্চিমবঙ্গের অম্লজমির উৎপাদিকা শক্তি বৃদ্ধির জন্য কৃষি ব্যবস্থাপনা—বিষ্ণু মণ্ডল, 'সার সমাচার,' মাঘ—চৈত্র, ২৩—২৪।

২৩। লবণাক্ত জমিতেও ভাল ফসল করা যায়—বলাই লাল জানা, দৈনিক বসুমতী, বুধবার, ১৯শে ফাল্গুন, ১৩৮২, ৬ষ্ঠ পৃষ্ঠা।

২৪। লবণাক্ত ও ক্ষারজমিতে সার ব্যবহার—বলাই লাল জানা, স্মরণিকা, কৃষক মেলা ও কৃষি প্রদর্শনী। ভারত-জার্মান সার প্রশিক্ষণ প্রকল্প, তমলুক, ১৯৭৫।

২৫। মেদিনীপুরের লবণাক্ত জমি ও তার উৎপাদন কলাকৌশল—বলাই লাল জানা, 'সারসমাচার', কার্তিক, ১৩৮৩ : ১১—১২।

২৬। লবণাক্ত ও ক্ষার জমিতে সারের ব্যবহার—বলাই লাল জানা, 'সারসমাচার,' মাঘ ১৩৮২ ; ২৬—২৮।

২৭। মেদিনীপুরের লবণাক্ত জমি ও তার চাষবাস—বলাই লাল জানা, 'গ্রামের ডাক', ২২শে জানুয়ারী, ১৯৭৬, ও ১৫ই ফেব্রুয়ারী ; ১৯৭৬।

২৮। পাতার মধ্য দিয়ে সার ব্যবহার—বলাই লাল জানা, 'সার সমাচার', বৈশাখ, ১৩৬৮ ; ২১—২২।

২৯। আধুনিক কৃষিতে অনু খাদ্যের ব্যবহার—বলাই লাল জানা, 'সার সমাচার', বৈশাখ ১৩৮৫ ; ২৫—২৬।

৩০। মাটি ও সার—বিষ্ণু মণ্ডল, কৃষি অধিকার, পশ্চিমবঙ্গ।

৩১। পশ্চিমবঙ্গের কৃষিতে সার ব্যবহার—ডঃ শক্তিপদ ধুয়া, পশ্চিমবঙ্গ পরিচয় গ্রন্থমালা ; ২, সমতট রিসার্চ, ৫/১বি, দেশপ্রিয় পার্ক (পূর্ব), কলিকাতা-৭০০০২৯।

৩২। পশ্চিমবঙ্গের কৃষি ঃ জল—অধ্যাপক সত্যেশ চক্রবর্তী, পশ্চিমবঙ্গ পরিচয় গ্রন্থমালা ঃ ১, সমতট রিসার্চ।

৩৩। ভূমি সংরক্ষণের সমস্যা ও তার প্রতিকার—শ্রীঅমল কুমার মজুমদার, কৃষি অধিকার, পশ্চিমবঙ্গ সরকার।

৩৪। ভূমি ও জল সংরক্ষণ—ডঃ পি. কে. পাল ও কে. কে. মুখোপাধ্যায়, ত্রিপুরা সরকার, কৃষি বিভাগ, প্রচারপত্র সংখ্যা ২৪৪, ১৯৮০।

৩৫। পুরুলিয়া জেলার কৃষি আবহাওয়ায় চাষবাসের কলাকৌশল সম্পর্কে আলোচনাচক্র, ভারত-জার্মান সার প্রশিক্ষণ প্রকল্প ১৯৭৯।

৩৬। পুরুলিয়া জেলায় ভূমি ও জল সংরক্ষণ—শ্রী বিমলেন্দু দত্ত, কৃষি আলোচনাচক্র, ভারত-ব্রিটিশ সার প্রশিক্ষণ প্রকল্প, (হিন্দুস্থান ফার্টিলাইজার কর্পোরেশন লিঃ) পুরুলিয়া, ১৯৮২ ; ১৩—১৯।

ইংরাজী গবেষণাপত্র/বই/পত্র-পত্রিকা

1. ICRISAT Annual Reports, 1976-77. 1978-79.

2. ICRISAT Research Highlights, 1979.

3. ICRISAT at Work—A Progress Report.

4. Drought Prone Areas Programme, Govt. of India, Ministry of Agri & Irrigation, Dept. of Rural Development. New Delhi, 1978.

5. Development and transfer of Technology for Rainfed Agriculture and the SAT farmers, Proceedings of the inaugural Symposium at ICRISAT, 28 Aug—1 Sept, 1979.

6. Socio-economic Constraints to Development of Semi-Arid Tropical Agriculture, ICRISAT, Hyderabad, India. 19—23 Feb., 1979.

7. Proceedings—Agroclimatological Research needs of the Semi—Arid Tropics, ICRISAT, Hyderabad, India, 22—24 Nov. 1978.

8. Inaugural Address delivered at the 4th FAI Specialized Training Programme on "Management of Rainfed Areas", Sept 28, 1981 at Hyderabed, J. S. Kanwar, Director of Research, ICRISAT.

9. ICAR—Improved Agronomic Practices for Dryland crops in India, AICRIP for Dryland Agriculture, 2-2-58, Amberpet, Hyderabad—500013, 1982.

10. Farming Systems Components for selected Areas in India : Evidence from ICRISAT, H.P. Binswanger, S.M. Virmani and J. Kampanen, Research Bulletin No. 2, ICRISAT

11. FAI Group discussion on Fertilizer Use in Drylands, August 17—18 ; 1979 at New Delhi—Recommendations.

12. A Resume on Drought Condition and Damage of crops thereof and Programme of works to combat Drought, 1979-80, Purulia, Project Officer (Multiple Cropping), Purulia, A brief Report on: Drought Condition and Programme of work during 1979—80.

13. The Fertilizer Association of India Training Programme on Management of Rainfed Areas, Glossary of Terms for Land use crop Production in Rainfed Areas, Sept, 1976.

14. Problems and Prospects of growing wheat under Rainfed conditions of North Eastern Plain Zones of India, Mahatim Singh, Professor and Head, Coordinator, Dept of Agronomy, BHU, Varanasi—221005.

15. Fertilizer use in Dryland Agriculture, Fertilizer Information Bulletin, No. 13, European Nitrogen Service Programme, P.O. Box No. 3547, New Delhi—110024,

16. Intensive Agriculture, April—May, 1981, New Light on Dryland Farming, Vol, XIX, No. 2—3, Directorate of Extension, Ministry of Agriculture, Pratap Bhavan, 5 Bahadur Sah Zafar Marg, New Delhi—110002.

17. Farming Systems: Field Tour, 22 Sept, 1981, Tour, Notes, ICRISAT, 1981.

18. Technology for Management of Rainfed Soils in Drought Prone Areas of Maharastra and Gujrat—S. Y. Daftardar, 4th FAI Specialized Training Programme, Hyderabad, Sept 29, 1981.

19. Contingency Planning for Rainfed Areas—H.S. Subramoney, Madras Fertilizers Ltd., Manali, Madras, 4th FAI Training Programme, Sept. 29, 1981.

20. Fertilizer Use in Drylands—J Venkateswarlu, 4th. FAI Training Programme, Sept, 29, 1981.

21. Agro-climatic Conditions of Rainfed Areas of India in Relation to Fertilizer Use—S.M. Virmani, ICRISAT, 4th FAI Training Programme, Sept 28, 1981.

22. Management of Drylands of Andhra Pradesh and Karnataka—K. Vijaylakshmi, AICRP for Dryland Agricultuie, Hyderabad, 4th FAI Training Programme, Sept, 28, 1981 : 1—21.

23. Management of Rainfed Areas—Improved Agronomic Practices suited to varying Agro-climatic Regions of Rajasthan, Haryana & Punjab—R.P. Singh, AICRP for Dryland Agriculture, Hyderabad, 4th FAI Training Programme, Sept 28, 1981 : 1—27.

24. Agronomic Practices including Crops and Varieties, Cropping Systems, Soil and Water Management, Fertilizer use, Post Harvest Technology, Diseases & Pests under various Agro-climatic conditions—Uttar Pradesh, Madhya Pradesh, Bihar and Orissa—Mahatim Singh, Director, Institute of Agril. Sciences, BHU, 4th FAI Training Programme. Hyderabad, Sept 28, 1981.

25. All India Coordinated Research Project for Dryland Agriculture Operational Research Project, Hyderabad—N.K. Sanghi, AICRP for Dryland Agriculture, Hyderabad, FAI Training Programme, Sept 28, 1881 : 1—8.

26. ICRISAT'S Experience in on-Farm Research in the SAT —Ranjodh Singh, Farming Systems Research Programme, ICRISAT, 4th FAI Training Programme, Sept 28, 1981.

27. Experience in Developing Rainfed Areas—H.S. Subramoney, Madras Fertilizers Ltd, Manali, 4th FAI Training Programme, Sept 28, 1981.

28. Work Experience in Dryland Development Project. State Dept of Agriculture—G.M. Shariff, ADA, Andhra Pradesh, 4th FAI Specialized Training Programme, Hyderabad, October 1, 1961,

29. Sorghum and Millet Information Centre (SMIC) News Letter, Issue No, 6, August, 1981 (ICRISAT).

30. International Chickpea News Letter, ICRISAT, No. 4, June, 1981.

31. Rainfall climatology of West Africa : Niger—M.V.K. Shivakumar, S.M. Virmani and S. J. Reddy, ICRISAT, Information Bulletin No. 5.

32. International Workshop on Grain Legumes, ICRISAT, January 13—16, 1975.

33. Annual Report, 1978—79 : Drought Prone Area Programme Policy, Purulia (W.B.)

34. District Handbook—Annual Plan of Action (Agriculture), Purulia District, 1982—83.

35. Soil Fertility : Theory and Practice—ICAR, New Delhi, (1978).

36. Soils of India (1972), FAI, New Delhi (Near Jawharlal Nehru University).

37. Manures and Fertilizers—K.S. Yawalkar, J.P. Agarwal, S. Bokde, Agri-horticultural Pub. House, Nagpur.

38. Micronutrient Research in Soils and Plants in India—J.S. Kanwar, ICAR, New Delhi.

39. Pragmatic Value of Agriculture in Rural Development and its role in Vocational Education—B.L. Jana, Feature article published in "Samsad Parichiti", 2nd year, 9th & 10th Issue,

March—April, 1979, Council of Higher Secondary Education, West Bengal ; 173-176.

40. A Juvenile Return from Nitrogen Fertilization and Stand Structure in Jute—B.L. Jana, Fertilizer Digest (Journal of the Fertilizer Corporation of India Ltd, New Delhi), Vol, 15, Nov. 6, August-September, 1977 : 14—16.

41. Improving Jute Field in West Bengal—B.L. Jana, Farmer and Parliament, Vol XII, No. 11, Nov. 1977-22.

42. Effect of direction of planting on the Field of Jute—B.L. Jana and B.B. Chowdhury, Indian Journal of Agricultural Sciences, Vol. 46, No. 9, September 1976 ; 403—6.

43. Effect of Row Direction on Jute—B. B. Chowdhury, B.L. Jana, A.K. Patra and S.L. Basak, Indian Agriculturist. Vol. 20, No, 2, 1976 : 85—90.

44. Proceedings of the International Workshop on Chickpea Improvement, ICRISAT. Hyderabad, 28 Feb—2 Mar, 1979.

45. Proceedings—International Workshop on Groundnuts, ICRISAT, 13—17 Oct, 1980.

46. International Workshop on Pigeonpeas, Volume I, ICRISAT, 15—19 Dec, 1980.

47. Multiple Cropping in West Bengal—A. K. Sen Gupta, Lecture delivered in a seminar held at Narendrapur, 24 Parganas (West Bengal), 1979.

48. Role of Agricultural Mateorology, West Bengal Agricultural Department, Calcutta—Anonymous, 1982.

49. Report on situations created by unprecedented drought in different districts of West Bengal—Anonymous, 1982, West Bengal Rehabilitation Dept.

50. Farm Management—A. S. Kahlon & Karam Singh, ICAR. New Delhi (1978).

51. Desertification and its control, ICAR, New Delhi (1977).

52. Desert spread. A quantitative analysis in the arid zone of Rajasthan—Mann H.S., Malhotra, S.P. and Kalla. J. C., Ann. Arid zone, 13(2) : 103—113.

53. Dasgupta, K., Khilani, V.B, and Bhandari. U.M. 1973. An approximate assessment of exploitable groundwater protential of Rajasthan. Proc. Winter School Dev. Raj. Desert. Indian nantn. Sci. Acad. India, Jodhpur, Feb., 1973.

54. Pramik, S. K., Hariharan, S. P. and Ghosh, S. K., 1952. Meteorological conditions in the extension of the Rajasthan desert. Bull, natn. Inst. Sci. India, 1.

55. Dhir, R.P., Kolarkar, A.S. and Bhola, S.N. 1975. Use of saline water in agriculture. II. Crop growth & response to fertilizer application under saline water use in cultivators' fields. Ann. Arid zone 14(4) 277-84.

56. M. S. Swaminathan, 1977, Preface. Desertification and its Control, ICAR, New Delhi.

57. Ghosh A.B. and Hassan, R(1979). Indian Society of Soil Science Bulletin, 12-2-8.

58. Jha. D. and Sarin, R.(1980). Fertilizer Consumption and Growth in SAT India, Research Bulletin, ICRISAT.

59. Jha, D., Raheja, S.K.; Sarin, R and Mehrotra, P.C. (1981). Fertilizer use in SAT India—The case of high yielding varieties of sorghum and pearl millets. Economics Division Progress Report 2.

60. Venkateswarlu, J. FAI Discussion on Fertilizer use in Drylands, 1979.

61. Sahrawat. K.L. et al. FAI Group Discussion on Fertilizer use in Drylands, 1979.

62. Chowdhury, S. L., Fertilizer News, 1979, 24(9): 61-66, 101.

63. Mahapatra, I.C. et al., Fertilizer News. August 1973.

64. Singh, D. et al., Agric Situ India, 1975, 30(4): 237—240.

65. Meelu, O.P. et. al., Fertilizer News, 1976, 21(9): 34-38.

66. Venkateswarlu, J. and Spratt, E.D., Fertilizer News, 1977. 22(12): 34—43.

67. Singh, Ranjodh et al., Agronomy J., 1975, 67 : 599—603.

68. Proceedings of the FAI Group Discussion on Fertilizer use in Drylands, FAI, New Delhi, 67, 1979, pp. 181.

69. Dryland agriculture Research : Progress Report, 1970-75, ICAR 1977, pp. 27.

70. ICAR Coordinated Research Directorates / Projects on Sorghum, millets, barley, oilseeds, pulses and agronomic experiments.

71. M. S. Swaminathan, Forward—Improved Agronomic Practices for Dryland crops in India, ICAR, 1979. pp. 6.

72. Farming Systems Research and Technology for the semi arid Tropics-Jacob Kampen. Proceedings of the International Symposium on Development & Transfer of Technology for Rainfed Agriculture & the SAT Farmer, ICRISAT Center. 1979 : 39—56.

73. Binswanger, H.P. Krantz, B.A. and Virmani, S. M. 1976. The role of the ICRISAT in farming systems research Hyderabad, India : ICRISAT.

74. The ICRISAT Cooperative program in Upper Volta W.A. Stoop and C.M. Pattanayak, 1979. Develop and Transfer of Technology for Rainfed Agriculture and the SAT farmer, pp. 143—150.

75. Philippine Experience in crops in Dry Areas—J. D. Drilon Jr. and Ed. B. Pantastico. Proceedings of the Inaugural Symposium at ICRISAT, 1979 : 251—261.

76. Indian Experiences in the Semi Arid Tropics : Prospect and Retrospect. N.S. Randhawa and J. Venkateswarlu. Proceedings of the inaugural symposium at ICRISAT, 1979 : 207—2 0.

77. Development and Transfer of Technology for Rainfed Crop Production In Thailand. Ampol Senanarong, Proceedings of the inaugural Symposium at ICRISAT, 1979, pp. 247—250.

78. Generation and Transfer of Technology in the Americas. Leland R. House, Proceedings of the Inangural Symposium at ICRISAT (1979) : pp. 151—155.

79. Project Guide, 1983. Hindustan Fertilizer Corporation Ltd, Indo-British Fertilizer Education Project, 52 A Shakespeare Serani, Calcutta—700017.

80. Chowdhury P.C. and Chatterjee, B.N. (1967). Moisture Conservation under mulches in the eroded terraced soils of Ranchi. J. Soil & Water Cons. in India, 15 (1 & 2) : 61—71.

81. Sinha, B.P. and Chatterjee, B.N. (1968). Soil moisture status and root Contents of grasses at different soil depths, J, Soil & Water Cons. in India, 16(1 & 2) : 28—32.

82. Chatterjee, B. N., Roy, B. and Bhattacharyya, K. K. (1971). *Pennisetum pedicellatum* as a short rotation forage crp

for the eastern region of India. 58th session of the Indian Sci. Congress.

83. Chatterjee, B.N. and Maiti, S. (1974). Role of grasses for soil conservation in eastern India. Soil Conservation Digest, 2(1) : 15—23.

84. Sen Gupta, K. and Bhattacharyya, K.K. (1981). A thesis entitled "Seed treatment in relation to kalai (*Vigna mungo* L.) yield in dryland agriculture" of the 1st author, submitted to BCKVV, Kalyani.

85. Singh. A.I. and Chatterjee. B.N. (1980). Effect of seed treatment and fertilization on the upland rice production. Indian J. Agrn 25(3) : 479—486.

86. Khan, S.A. and Chatterjee, B.N. (1981). Influence of seed soaking and sowing dates on wheat field, Indian J. Agrn. 26(3) : 272—277.

87. Singh, A.I. and Chatterjee, B.N. (1980). Barley production under rainfed condition with pre-treated seeds. Indian J. Agrn 25(4) : 600—607.

88. Khan, S.A. and Chatterjee, B.N. (1982). Growing greengram with minimum tillage. Indian J. agric. Sci. 32(2) : 117—9.

পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ প্রকাশিত ও প্রকাশিতব্য অন্যান্য বিজ্ঞান পুস্তিকা

১। সমুদ্র পরিচয়/প্রসাদ সেনগুপ্ত/৮·০০
২। পেশাগত ব্যাধি/শ্রীকুমার রায়/৭.০০
৩। আমাদের দৃষ্টিতে গণিত/প্রদীপকুমার মজুমদার/৭·০০
৪। শক্তি : বিভিন্ন উৎস/অমিতাভ রায়/৭·০০
৫। মানুষের মন/অরুণকুমার রায়চৌধুরী/৪·০০
৬। বয়ঃসন্ধি/বাসুদেব দত্ত চৌধুরী/৯·০০
৭। ভূতাত্ত্বিকের চোখে বিশ্বপ্রকৃতি/সঙ্কর্ষণ রায়/৮·০০
৮। রোগ ও তার প্রতিশোধ/সুখময় ভট্টাচার্য/৬·০০
৯। পশুপাখীর আচার ব্যবহার/জ্যোতির্ময় চট্টোপাধ্যায়/৮·০০
১০। ময়লা জল পরিশোধন ও পুনর্ব্যবহার/ধ্রুবজ্যোতি ঘোষ/৬·০০
১১। গ্রাম পুনর্গঠনে প্রযুক্তি/দুর্গা বসু/১০·০০
১২। একশো তিনটি মৌলিক পদার্থ/কানাইলাল মুখোপাধ্যায়/১০·০০
১৩। পরিবর্তী প্রবাহ/ডঃসমীরকুমার ঘোষ/৭·০০
১৪। বাস্তব সংখ্যা ও সংহতিতত্ত্ব/প্রদীপকুমার মজুমদার/১০·০০
১৫। অতিশৈত্যের কথা/দিলীপকুমার চক্রবর্তী/৭·০০
১৬। এফিড বা জাবপোকা/মনোজরঞ্জন ঘোষ
১৭। সয়াবীন/দ্বিজেন গুহবক্সী/৯ ০০
১৮। জৈবসার ও কৃষিবিজ্ঞানে জীবাণুর অবদান/শ্যামল বণিক
১৯। পাতালের ঐশ্বর্য/সংকর্ষণ রায়/১০·০০
২০। নিয়ন্ত্রিত ক্ষেপণাস্ত্র/সুশীল ঘোষ/১২·০০
২১। ঘরে করো শিল্প গড়ো/তিলক বন্দ্যোপাধ্যায়/১১·০০
২২। আমাদের জীবনে পাখী/সুধীন সেনগুপ্ত/১৪·০০
২৩। জিওল মাছ/শচীন্দ্রমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়/১২·০০
২৪। ক্যাকটাস ও ফুলচাষ/বলাইলাল জানা
২৫। আবহাওয়া ও আমরা/অপরাজিত বসু/১০·০০
২৬। হাঁপানি রোগ/মনীশচন্দ্র প্রধান/৬·০০

আঠারো টাকা